Approved by the W. B. Board of Secondary Education
as a Text Book of Bengali for Class VIII.
Vide T. B. No. 76/8/T. B./39. Dated 27.12.76,

সাহিত্য-মঞ্জুষা

(অষ্টম শ্রেণীর সাহিত্য-পাঠ)

পরিমল সেন, এম. এ., বি. টি.
প্রধান শিক্ষক, পদ্মপুকুর ইনস্টিটিউশন, কলিকাতা ; ভূতপূর্ব
প্রধান শিক্ষক জগাছা হাইস্কুল, হাওড়া ও
গোপালপুর হাইস্কুল দুর্গাপুর

এবং

সাহিত্য-পরিচিতি, ব্যাকরণ ও রচনা পরিচিতি, পুরাণ পরিচিতি,
বিদ্যাসাগর বৃত্তান্ত, বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ ইত্যাদি
গ্রন্থ-প্রণেতা কর্তৃক পরিমার্জিত

: সংকলন করেছেন :

শ্রীঅবনীমোহন বিশ্বাস, এম. এ.; বি. টি.
শিক্ষক, করিমপুর জগন্নাথ উচ্চ বিদ্যালয়, নদীয়া

ও

শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাল, এম. এ, বি. টি.
শিক্ষক, বেথুয়াডহরী জে, সি, এম, উচ্চ বিদ্যালয় ;
প্রাক্তন শিক্ষক দেশবন্ধু উচ্চ বিদ্যালয়,
বেলপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়

চতুর্মুখ প্রকাশন

সূচীপত্র

[গদ্যাংশ]

[পদ্যাংশ]

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে অনেকে বাঙলা গদ্যের জনক বলেন। যদিও প্রয়োজনের তাগিদে তিনি লেখনী গ্রহণ করেছিলেন, তবু তাঁর চেষ্টাতেই বাঙলা ভাষায় প্রথম যথার্থ সাহিত্যিক গদ্য সৃষ্টি হয়। তাঁর ভাষার আদর্শেই বঙ্কিমচন্দ্র গদ্য রচনা শুরু করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। আরুণির উপাখ্যান তাঁর মহাভারতের অনুবাদ থেকে সংকলিত হয়েছে।]

আয়োদধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার উপমন্যু, আরুণি ও ধৌম্য নামে তিন শিষ্য। তিনি পাঞ্চালদেশীয় আরুণি নামক শিষ্যকে ক্ষেত্রের আলি বন্ধন করিতে পাঠাইয়া দিলেন। পাঞ্চাল্য আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে তথায় গমন করিলেন, কিন্তু আলি বন্ধন করিতে পারিলেন না। তিনি বিস্তর ক্লেশ স্বীকার করিয়াও কোনক্রমে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া, পরিশেষে এক উপায় দেখিয়া স্থির করিলেন, 'ভাল, ইহাই করিব'—এই নিশ্চয় করিয়া তিনি সেই কেদারখণ্ডে শয়ন করিলেন। শয়ন করাতে জলনির্গম নিবারিত হইল।

পরে উপাধ্যায় আয়োদধৌম্য শিষ্যদিগকে জিজ্ঞাসিলেন, "পাঞ্চাল্য আরুণি কোথায় গেল?"

তাহারা বিনীত বদনে উত্তর করিলেন, "ভগবন্! আপনি তাহাকে ক্ষেত্রের আলিবন্ধনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ঋষি শিষ্যদিগকে কহিলেন, "তবে চল, আমরা সেখানে যাই।"

অনন্তর তিনি তথায় গমন করিয়া এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, "ওহে বৎস পাঞ্চাল্য আরুণি! তুমি কোথায় আছ, আইস।" আরুণি উপাধ্যায়-বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা সেই কেদারখণ্ড হইতে গাত্রোত্থানপূর্বক তাঁহার নিকটে আসিয়া নিবেদন করিলেন, "মহাশয়! আমি উপস্থিত হইয়াছি, কেদারখণ্ড হইতে যে জল নির্গত হইতেছিল, অবারণীয় হওয়াতে তাহা রোধ করিবার নিমিত্ত তথায় শয়ন করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনার শব্দ শুনিয়া সহসা কেদারখণ্ড বিদীর্ণ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম, অভিবাদন করি, এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন।" শিষ্যবাক্যাবসানে উপাধ্যায় তদীয় গুরুভক্তির দৃঢ়তা দর্শনে প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি কেদারখণ্ডের আলি বিদীর্ণ করিয়া উত্থান করিয়াছ, অতএব তুমি অদ্যাবধি উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইবে; আর আমার বাক্য প্রতিপালন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তোমার মঙ্গল হইবে, বেদ ও সমুদয় ধর্মশাস্ত্র সর্বকাল তোমার স্মরণপথারূঢ় থাকিবে।" আরুণি এইরূপ উপাধ্যায়-বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত দেশে প্রস্থান করিলেন।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন :—

১। প্রাচীনকালে গুরুর প্রতি শিষ্য কি রকম ভক্তি দেখাত? এর দ্বারা তার চরিত্রের কি গুণ বিকশিত হত? তোমার পঠিত গল্প থেকে এমন গুরুভক্তির কাহিনী বল। [৩+২+৫]

২। আরুণির বাড়ি ছিল কোন্ দেশে? তিনি কোন্ গুরুর শিষ্য ছিলেন?

গুরুদেব তাকে কি আদেশ দেন? তিনি সে আদেশ প্রতিপালনের জন্য কি কি করেন? এর পরিণতি কিহয়? [১+১+১+৩+৪]

॥ **ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন** ॥

৩। তুমি কেদার খণ্ডের আলি বিদীর্ণ করিয়া উত্থান করিয়াছ, অতএব তুমি অদ্যাবধি উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইবে।

এই অংশ কাহার লেখা কোন্ রচনা থেকে নেওয়া হয়েছে? কে কেন আলি বিদীর্ণ করে এলেন? কে কেন এই আশীর্বাদ করেন? এই ঘটনা হইতে তাহার কি গুণের পরিচয় পাওয়া যায়? 'উদ্দালক' শব্দের তাৎপর্য কি?

৪। 'আরুণি' আখ্যায়িকা অবলম্বনে প্রাচীনকালে গুরুর প্রতি শিষ্যের যে ভক্তির পরিচয় পাও, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৫। 'আরুণি' আখ্যায়িকাটি নিজের ভাষায় লেখ।

॥ **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন** ॥

৬। আরুণির 'উদ্দালক' নাম হল কেন? [৩]

৭। 'আরুণি' উপাখ্যান থেকে কোন্ আদর্শ শিক্ষা করা যায়? [৩]

॥ **ব্যাকরণগত প্রশ্ন** ॥

৮। অর্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর :—

উচ্চৈঃস্বরে, কেদারখণ্ড, অবারণীয়, বিদীর্ণ, অভিলষিত।

৯। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

আদেশানুসারে, আলিবন্ধনার্থ, গাত্রোত্থান, নির্গত, অদ্যাবধি, স্মরণপথারূঢ়।

১০। পদ পরিবর্তন কর :—

বন্ধন, কৃতকার্য, নিবারিত, বিনীত, শ্রবণ, উপস্থিত, নির্গত, প্রসিদ্ধ, সন্তুষ্ট, অভিলষিত, প্রস্থান।

১১। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ :—

কৃতকার্য, জলনির্গম, গাত্রোত্থানপূর্বক, অবারণীয়, স্মরণপথারূঢ়, সর্বকাল।

রেশম : বাংলার গর্ব

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

[হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই ছিলেন অসামান্য পণ্ডিত। তিনি বাঙলা ভাষা এবং দেশীয় সংস্কৃতির মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য আজীবন সাধনা করেন। নেপাল রাজ-গ্রন্থাগার থেকে তিনি এমন এক গ্রন্থ উদ্ধার করেন যাতে বাঙলা ভাষার জন্ম-লগ্নের রূপ পাওয়া যায়। গ্রন্থটির নাম "হাজার বছরের পুরাণ বৌদ্ধ গান ও দোঁহা"।

শাস্ত্রী মশাই ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ৬ই ডিসেম্বর ২৪ পরগণা জেলার নৈহাটীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

চাণক্যের অর্থশাস্ত্র থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে তিনি এই প্রবন্ধে বাঙলার এক গৌরবের বিষয় উদ্ধার করেছেন। লেখকের ভাষা স্বচ্ছ এবং সরল।]

বাংলার অন্যতম গৌরব রেশমের কাজ। ইউরোপীয়েরা চীন দেশ হইতে রেশমের পোকা আনিয়াছিলেন এবং অনেক শত বৎসর চেষ্টা করিয়া তাঁহারা রেশমের কারবার খুলিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের সংস্কার, চীনই রেশমের জন্মস্থান ; চীনারাও তাহাই বলে। তাঁহারা বলেন খ্রীস্টের ২৬৪০ বৎসর পূর্বে চীনের রাণী তুঁত গাছের চাষ আরম্ভ করেন। রেশমের ব্যবস্থা সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল

হইতেই চীনদেশে অনেক লেখা আছে। চীনারা রেশমের চাষ কাহাকেও শিখিতে দিত না। এটি তাহাদের উপনিষদ্ বা গুপ্ত বিদ্যা ছিল। জাপানীরা অনেক কষ্টে খ্রীস্টের তৃতীয় শতকে কোরিয়ার নিকট রেশমের চাষ শিক্ষা করে। ইহারই কিছুদিন পরে চীনের এক রাজকন্যা ভারতবর্ষে উহার চাষ আরম্ভ করেন। ইউরোপে খ্রীস্টের প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে স্থলপথে চীনের সহিত রেশমের ব্যবসা চলিত। অনেকে মনে করেন, এই রেশমের ব্যবসার জন্যই পাঞ্জাবের শক রাজারা বেশী করিয়া সোনার টাকা চালান। ইউরোপে রেশমের চাষ ইহার অনেক পরে আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু আমরা চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই, বাংলা দেশে খ্রীস্টের তিনি-চারি শত বৎসর পূর্বে রেশমের চাষ খুব হইত। রেশমের খুব ভাল কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণা' অর্থাৎ পাতার রেশম। পোকাতে পাতা খাইয়া যে রেশম বাহির করে সেই রেশমের কাপড়ের নাম 'পত্রোর্ণা। সেই পত্রোর্ণা তিন জায়গায় হইত—মগধে, পৌণ্ড্র দেশে ও সুবর্ণকুণ্ডে। নাগবৃক্ষ, লিকুচ, বকুল, আর বট গাছে এই পোকা জন্মিত। নাগবৃক্ষের পোকা হইতে হলদে রঙের রেশম হইত, লিকুচের পোকা হইতে যে রেশম বাহির হইত তাহার রঙ গমের মত, বকুলের রেশমের রঙ সাদা, আর বট গাছের রেশমের রঙ ননীর মত। এই সকলের মধ্যে সুবর্ণকুণ্ডের 'পত্রোর্ণা' সকলের চেয়ে ভাল, ইহা হইতেই কৌষেয় বস্ত্র ও চীনভূমিজাত চীনের পট্টবস্ত্রেরও ব্যাখ্যা হইল।

উপরে যেটুকু লেখা হইল, তাহা প্রায়ই অর্থশাস্ত্রের তর্জমা। অর্থশাস্ত্রের যে অধ্যায়ে কোন্ কোন্ ভাল জিনিস রাজকোষে রাখিয়া দিতে হইবে তাহার তালিকা আছে। সেই অধ্যায়ের শেষ অংশে ঐ সকল কথা আছে। অধ্যায়ের নাম 'কোষপ্রবেশ্য রত্ন পরীক্ষা'। এখানে রত্ন শব্দের অর্থ কেবল হীরা-জহরৎ নয়, যে পদার্থের যাহা

উৎকৃষ্ট সেইটির নাম রত্ন। এই রত্নের মধ্যে অগুরু আছে, চন্দন আছে, চর্ম আছে, পাটের কাপড় আছে ও তুলার কাপড় আছে। যে অংশ তর্জমা করা হইল, তাহাতে মগধ ও পোণ্ড্রদেশের নাম আছে, এই দুইটি দেশ সকলেই জানেন। মগধ—দক্ষিণ-বিহার। আর পৌণ্ড্র—বরেন্দ্রভূমি। সুবর্ণকুণ্ড কোথায়? প্রাচীন টীকাকার বলেন, সুবর্ণকুণ্ড কামরূপের নিকট। কিন্তু কামরূপের নিকট যে রেশম এখন হয়, তাহা ভেরেণ্ডা পাতায় হয়। আমি বলি, সুবর্ণ-কুণ্ডের নাম শেষে কর্ণসুবর্ণ হয়। কর্ণসুবর্ণ মুর্শিদাবাদ ও রাজমহল লইয়া। এখানকার মাটি সোনার মত রাঙা বলিয়া, এ দেশকে কর্ণসুবর্ণ, কিরণসুবর্ণ বা সুবর্ণকুণ্ড বলিত। এখানে এখনও রেশমের চাষ হয়, এখানকার রেশম খুব ভাল। নাগবৃক্ষ এখানে খুব জন্মায়। নাগবৃক্ষ শব্দের অর্থ নাগকেশরের গাছ। নাগকেশর বাংলার আর কোনখানে বড় দেখা যায় না, কিন্তু এখানে অনেক দেখা যায়। লিকুচ—মাদার গাছ। মাদার গাছেও রেশমের পোকা বসিতে পারে। বকুল ও বটগাছ প্রসিদ্ধই আছে। কৌটিল্য যেভাবে চীনদেশের পট্টবস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি চীনদেশের রেশমী কাপড় অপেক্ষা বাংলার রেশমী কাপড় ভাল বলিয়া মনে করিতেন। রেশমী কাপড় যে চীন হইতেই বাংলায় আসিয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণই অর্থশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। চীনের রেশম তুঁত গাছ হইতে হয়। বাংলার রেশমের তুঁত গাছের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। সুতরাং বাঙালী যে রেশমের চাষ চীন হইতে পাইয়াছে, একথা বলিবার জো নাই। এখন পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইলে এই কথা বলিতে হইবে যে, রেশমের চাষ বাংলাতেও ছিল, চীনেও ছিল। তবে তুঁত গাছ দিয়া রেশমের চাষ চীন হইতেই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র যে রেশমের চাষ ছিল একথা চাণক্য বলেন না। তিনি বলেন, বাংলায় ও মগধেই রেশমের চাষ ছিল। কারণ, পৌণ্ড্রও বাংলায়, সুবর্ণকুণ্ডও বাংলায়।

চাণক্যের পরে কিন্তু ভারতবর্ষের নানা স্থানে রেশমের চাষ হইত। কারণ, মান্দাসোরে খ্রীস্টীয় ৪৭৬ অব্দের যে শিলালেখ পাওয়া যায়, তাহাতে লেখা আছে যে, সৌরাষ্ট্র হইতে একদল রেশম-ব্যবসায়ী মান্দাসোরে আসিয়া রেশমের ব্যবসা আরম্ভ করে এবং তাহারাই চাঁদা করিয়া এক প্রকাণ্ড সূর্যমন্দির নির্মাণ করে।

অর্থশাস্ত্র হইতে আমরা যে সংবাদ পাইলাম, সেটি বাংলায় বড়ই গৌরবের কথা। যদি বাঙালীরা সকলের আগে রেশমের চাষ আরম্ভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তো তাঁহাদের গৌরবের সীমাই নাই। যদি চীনেই উহা সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় তথাপি বাঙালীরা চীন হইতে কিছু না শিখিয়াই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে যে রেশমের কাজ আরম্ভ করেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহারা তো আর তুঁতপাতা হইতে রেশম বাহির করিতেন না। এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি, যে সকল গাছ বিনা চাষে তাঁহাদের দেশে প্রচুর জন্মায়, সে সকল গাছের পোকা হইতেই তাঁহারা নানা রঙের রেশম বাহির করিতেন। চীনের রেশম সবই সাদা, তাহা রং করিতে হয়। বাংলার রেশম রং করিতে হইত না, গাছ বিশেষের পাতার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন রঙের সুতা হইত। আর এ বিদ্যা বাংলার নিজস্ব, ইহা কম গৌরবের কথা নয়।

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। রেশমের চাষ প্রথমে কোথায় হয়েছিল? 'পত্রোর্ণা' কি? এর উল্লেখ কোথায় আছে? পত্রোর্ণা কোথায় কোথায় তৈরী হত? কোন্ কোন্ গাছে এই রেশম পোকা জন্মাত এবং সেই রেশমের রং কেমন ছিল? কৌষেয় বস্ত্র কি? [২+২+১+২+২+১]

২। 'রত্ন' শব্দটির অর্থ কি? মগধ ও পৌণ্ড্রদেশ কাকে বলা হত? কর্ণসুবর্ণ কোন্ দেশকে এবং কেন বলা হয়? [২+৪+৪]

৩। লেখকের মতে চীনের রেশম থেকে বাংলার রেশম শ্রেষ্ঠ কেন? রেশম কি কারণে বাংলার গৌরব? [৫+৫]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৪। সূর্যমন্দির কারা কোথায় কিজন্য তৈরী করেছিলেন? [৩]

৫। রেশমের কথা আমরা কোন্ পুস্তক থেকে জানতে পারি? এ পুস্তকের লেখক কে? [২+২]

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৬। অর্থ বল :—

উপনিষদ্, কৌষেয়, তর্জমা, শিলালেখ, স্বতন্ত্র।

৭। পদ পরিবর্তন কর :

সংস্কার, উৎকৃষ্ট, পরিষ্কার, নির্মাণ।

৮। ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম বল :—

জন্মস্থান, রাজকন্যা, অর্থশাস্ত্র।

৯। বিপরীতার্থক শব্দ লেখ :—

শেষ, প্রাচীন, প্রচুর, গৌরব।

ভারতীয় শিল্প নাশের কারণ

সখারাম গণেশ দেউস্কর

[সখারাম গণেশ দেউস্কর জাতিতে মারাঠী। উনবিংশ শতকে যাঁরা প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করে দেশে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, সখারাম তাঁদের অন্যতম। তাঁর লেখা 'দেশের কথা' নামক গ্রন্থটি স্বদেশী চিন্তায় চিন্তিত মানুষদের সমাদর লাভ করেছিল।

সখারাম ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১২ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।]

অনেকের বিশ্বাস, বিলাতে বাষ্পায় বলে পরিচালিত যন্ত্রাদির উদ্ভাবন হওয়াতেই এ দেশের শিল্পীর গৌরব হ্রাস পাইয়াছে। বাষ্পীয় যন্ত্রে জাত পণ্যের সহিত হস্তকৌশলে নির্মিত শিল্পসামগ্রী প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হওয়াতেই ভারতীয় শিল্পের অবনতি ঘটিয়াছে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া অনেকেই এ দেশীয় শিল্পীকুলের নিন্দায় অগ্রসর হন, তাঁহারা শিল্পকার্যে বাষ্পীয় যন্ত্রাদির সহায়তা গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন। যাঁহারা এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী, তাঁহারা দেশীয় শিল্পনাশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত অবগত নহেন। বিজ্ঞানানুমোদিত যন্ত্রাদির সহিত প্রতিযোগিতায় যে এ দেশের শিল্পীদিগকে কিয়ৎপরিমাণে বিপন্ন হইতে হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পী-

সমাজে যে বিষম দুর্দিনের উদয় হইয়াছে, তাহার অন্যবিধ গুরুতর কারণ আছে। এ স্থলে সেই কারণের আলোচনা করা যাইতেছে।

ভারতবর্ষীয় শিল্প-নাশের সর্বপ্রধান কারণ ইংরাজের অত্যাচার ও অপরিমেয় স্বার্থপরতা। ইংরাজ এদেশে বণিক্‌বেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কাজেই এ দেশের বাণিজ্যে একাধিপত্য-লাভের বাসনা তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্বভাবতঃই বলবতী হইয়াছিল। এই বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা যে সকল অবৈধ ও লোমহর্ষক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

১৬০০ খৃস্টাব্দে বিলাতের একদল ব্যবসায়ীর ৭০ হাজার পাউণ্ড (বা সে সময়কার হিসাবে ৭ লক্ষ টাকা) মূলধন লইয়া ভারতে বাণিজ্য করিবার জন্য প্রথম পদার্পণ। এই ব্যবসায়ীর দল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে পরিচিত। প্রায় একশত বৎসরকাল মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে ব্যবসায় চালাইয়া ১৬৯০ খৃস্টাব্দে ইহারা বঙ্গদেশে কলিকাতা ক্রয়পূর্বক তথায় একটি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করিলেন।

ইহারা ব্যবসায়ের ও প্রতিপত্তি-লাভের সুবিধার জন্য মুখে বড় বড় নীতিকথা প্রচার করিলেও—কার্যত সর্বপ্রকার নীতিবিগর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া অর্থ-সংগ্রহে পরম আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, তজ্জন্য শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সমান দুর্ব্যবহারে বিরত হইতেন না। ব্যবসায়ে একাধিপত্য রক্ষার প্রতি ইহাদের পূর্বাবধি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তদানীন্তন মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট এই সকল দস্যুবৃত্ত পাশ্চাত্য বণিকদিগের কীর্তিকলাপ অগোচর রহিল না। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বৈদেশিক ব্যবসায়ীদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। আদেশমাত্র সুরাট হইতে ইংরাজেরা নিষ্কাশিত হইলেন, তাঁহাদের ধৃষ্ট কর্মচারিগণ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন; বোম্বাই, মছলীপত্তন ও ভিজাগাপত্তন প্রভৃতি ইংরাজের বাণিজ্যকেন্দ্র-সমূহ অধিকৃত হইল, ইংরাজ বিষম বিপন্ন হইলেন।

পরিশেষে তাঁহারা নিতান্ত দীনভাবে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ও ১,৫০,০০০ টাকা জরিমানা দিয়া অব্যাহতি লাভ করিলেন। আওরঙ্গজেব ভাবিলেন,—ইংরাজের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, তাহাদিগের শক্তি প্রায় নির্মূল হইয়া গিয়াছে, আর তাহারা মস্তকোত্তোলন করিতে পারিবে না। এইরূপে সম্রাটের উদারতায় ইংরাজ পুনরায় বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

আওরঙ্গজেবের পৌত্রের নিকট হইতে ইংরাজেরা নানা কৌশলে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। এই অধিকারের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পণ্যাদি আমদানি-রপ্তানির মাশুল না দিয়াও বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রেরিত হইত। বলা বাহুল্য, কোম্পানির ব্যবসায় তখন বড় অধিক বিস্তৃত ছিল না। কিন্তু কোম্পানির ভৃত্যগণ বাদশাহী সনদের ও কোম্পানির নামের দোহাই দিয়া যাহাকে-তাহাকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার পরোয়ানা বিক্রয়পূর্বক আত্মোদর পূর্ণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে দেশের লোকের স্বাধীন বাণিজ্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। বঙ্গেশ্বরও ন্যায্য শুল্ক লাভে বঞ্চিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে ইংরাজ বণিকের কল্যাণে সর্বপ্রথম বঙ্গীয় রাজকোষের ও দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের ক্ষতি আরব্ধ হইল।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর এদেশে ইংরাজের প্রতিপত্তি বাড়িল। ইংরাজেরা মীরজাফরকে প্রথমে নবাব করিয়া পরে স্বপ্রয়োজনানুরোধে তাহাকে পদচ্যুত করিলেন। মীরজাফরের পর মীরকাশিমের প্রতি তাঁহারা বিশেষ সদয় হইলেন। ফলে তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট শোভা পাইতে লাগিল। তিনি নামে নবাব হইলেন, ইংরাজেরা প্রায় সর্বময় কর্তা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু মীরকাশিম নিতান্ত দুর্বলচিত্ত ছিলেন না। দরিদ্র প্রজার দুঃখ মোচন করিতে গিয়া তাঁহাকে ইংরাজের কোপানলে ভস্মীভূত হইতে হইল। মীরজাফর আবার নবাবের পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ইংরাজেরা আবার অকথ্য অত্যাচারে বাঙালীকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। লোকের সর্বস্ব অপহরণই সে সময় ইংরাজদিগের এদেশে শাসনের মূলমন্ত্র ছিল।

পলাশীতে যুদ্ধাভিনয়ের পর হইতে বঙ্গে ইংরাজের যেমন প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল, তেমনই তাঁহারা বাণিজ্যের স্বত্ব বলপূর্বক বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোম্পানির ভৃত্যেরা তাহাদিগের প্রভুর জন্য অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পাইয়া প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ব্যক্তিগত ব্যবসায় বিনা শুল্কে এদেশে চালাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। প্রথম এই কার্য গোপনে সম্পাদিত হইত। বঙ্গের হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলা এই অবৈধ বাণিজ্য ব্যাপারে বাধা প্রদান করিতে গিয়া ইংরাজের বিষনয়নে পতিত হন। সুচতুর ইংরাজ সেকালের কতিপয় অদূরদর্শী বঙ্গীয় কূটনীতিপরায়ণ ব্যক্তির সাহায্যে সিরাজকে পদচ্যুত ও নিহত করাইয়া আপনাদিগের অবাধ বাণিজ্য বিস্তারের পথ নিষ্কণ্টক করিলেন।

এই প্রসঙ্গে কোনও সহৃদয় লেখক বলিয়াছেন,—যেদিন হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ফকিরের বেশে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিন হইতে ভারতলুণ্ঠন আরম্ভ হইল। মীরজাফর, ক্লাইভ ও অন্য কয়েকজন ইংরাজ, আমীর বোখাঁ, নবকৃষ্ণ ও রামচাঁদ একত্র হইয়া মুর্শিদাবাদের ধনাগারে প্রবেশপূর্বক ধনবিভাগ করিতে লাগিলেন।

নবাব মীরকাশিম ইংরাজের অবাধ বাণিজ্যে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ফলবতী না হওয়ায় তিনি দেশীয় বাণিজ্যেরও শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন। কারণ, তিনি দেখিলেন যে, স্বরাজ্যে বিদেশীয় বণিকদিগকে বিনা শুল্কে ব্যবসায় করিতে দেওয়ায় শুল্কপ্রদানকারী স্বদেশীয় বণিক-সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তাঁহার এই সৎকার্যে বাণিজ্যক্ষেত্রে বাঙালী ও ইংরাজ বণিক সমান অধিকার লাভ করিলেন। ইহাতে বাণিজ্য বিভাগীয়

রাজস্বের আশা নবাবকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু প্রজার মঙ্গলের জন্য এইরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও মীরকাশিম অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারিলেন না। কলিকাতার স্বার্থান্ধ ইংরাজ বণিকেরা নির্লজ্জের ন্যায় মীরকাশিমের এই ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তাঁহারা কয়েকটি বিশেষ পণ্যের একাধিকার লাভের জন্যই যদি বিবাদ করিতেন, তাহা হইলেও তাহা কিয়ৎপরিমাণে সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারা যাইত। কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহারা বঙ্গদেশে শ্বেতাঙ্গমাত্রের পক্ষে সর্ববিধ পণ্যের অবাধ বাণিজ্যে একাধিপত্য লাভ ও দেশীয় বণিকদিগের উপর গুরুতর শুল্কভার স্থাপনের জন্য মীরকাশিমকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সে অবৈধ অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হওয়ায় ইংরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। সে যুদ্ধে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে প্রজাহিতৈষী নবাবকে গেড়িয়া ও উদয়নালায় পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে হইল।

জগতের ইতিহাসে এইরূপ অন্যায় সমরের আর একটি দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা, সন্দেহ। কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায়ে মনুষ্যমাত্রেরই যে সাধারণ অধিকার আছে, এ দেশের তদানীন্তন ইংরাজ রাজপুরুষেরা সেই স্বাভাবিক অধিকার হইতেও এদেশবাসীকে বঞ্চিত করিবার জন্য যে বহু প্রকার গর্হিত উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে।

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। এ দেশীয় শিল্পের অবনতির জন্য শিল্পীদের দায়ী করেন কারা? তাদের যুক্তি কি? এর বিরুদ্ধ মতটি যুক্তিসহ বল। [২+৩+৫]

২। ইংরেজরা কি উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন? এদেশে এসে তারা

কেমন আচরণ করেন? আওরঙ্গজেব, সিরাজদ্দৌলা ও মীর কাসিমের সঙ্গে তাদের ব্যবহারের পার্থক্য দেখাও। [২+২+৬]

৩। আওরঙ্গজেবের সহিত ইংরাজদের বিরোধিতা কিভাবে শুরু হয়? কিভাবে এর নিষ্পত্তি হ'ল? পরবর্তীকালে তাদের ব্যবহার কেমন হয়?
৪+২+৪

৪। সিরাজদ্দৌলার পতনের সাথে শিল্পের অবনতির সম্পর্ক কি? মীর-কাশিম শিল্প-উন্নতির জন্য কি কি করেন? তার ফল কি হয়েছিল?
[৪+৪+২]

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন :—

৫। এই বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহারা যে সকল অবৈধ ও লোমহর্ষক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

আলোচ্য অংশটি কোন্ লেখকের কোন্ রচনা থেকে গৃহীত? কি প্রসঙ্গে লেখক এ কথা বলেছেন? তাদের বাসনা কি ছিল? তারা কি ধরনের অত্যাচার করে? এর ফলে কি হয়? [২+১+১+২+১]

৬। যেদিন হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ফকির বেশে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন সেদিন হইতে ভারত লুণ্ঠন আরম্ভ হইল।

কার লেখা কোন্ প্রবন্ধে কি প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে?

সিরাজ কিরূপে ইংরেজদের বাধা দিল এবং সিরাজ রাজ্যচ্যুত হতেই বা তারা কি কারণে ভারত লুণ্ঠন শুরু করল? [৩+৪]

৭। জগতের ইতিহাসে এইরূপ অন্যায় সমরের আর একটি দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

কোন্ লেখক, কোন্ প্রবন্ধে, কি প্রসংগে একথা বলেছেন? কিরূপে এই সমর শুরু হয়? একে অন্যায় বলা হয়েছে কেন? [৩+৩+২]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৮। "অনেকের বিশ্বাস… ..."—বিশ্বাসটি কি? [৩]

৯। "ভারতীয় শিল্প-নাশের সর্বপ্রধান কারণ…" কারণটি বর্ণনা কর।

১০। "তাহা ভাবিলেও শরীর কণ্টকিত হইয়া ওঠে।" —কি ভাবিলেই? ভাবনাটি বল। [২+২]

ব্যাকরণগত প্রশ্ন

১১। টীকা লেখ

বাষ্পীয় যন্ত্রে জাত পণ্য. বাণিজ্যে একাধিপত্য, অবৈধ ও লোমহর্ষক উপায়, অবাধ বাণিজ্যের অধিকার, আমদানি-রপ্তানির মাশুল, বাণিজ্য করিবার পরোয়ানা, পলাশীতে যুদ্ধাভিনয়, বাণিজ্যের স্বত্ব, বাণিজ্য বিভাগীয় রাজস্ব, বিশেষ পণ্যের একাধিকার।

১২। পদ পরিবর্তন কর :

পরিচালিত, উদ্ভাবন, নির্মিত, তিরস্কার, অবগত, উদয়, বিতাড়ন, নিষ্কাষিত, শোভা, মোচন, সম্পাদিত, কণ্টকিত।

১৩। সন্ধিবিচ্ছেদ কর :

বিজ্ঞানানুমোদিত, একাধিপত্য, পদার্পণ, দুর্ব্যবহার, পূর্বাবধি, নির্মূল মস্তকোত্তোলন, বাণিজ্যাধিকার, পণ্যাদি, আত্মোদর, বঙ্গেশ্বর, প্রয়োজনানুরোধ, যথেচ্ছাচার, কোপানল, যুদ্ধাভিনয়, নিষ্কণ্টক, অভীষ্ট, স্বার্থান্ধ।

শশিভূষণের শাস্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বাঙলা সাহিত্যে যত মনীষী লেখক জন্মগ্রহণ করেছেন—রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিশ্ব-সাহিত্যেও তাঁর মতো প্রতিভাধরের জন্ম হয়নি।

১৮৬১খ্রীস্টাব্দের ৭ই মে (২৫-শে বৈশাখ) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তিনি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র। বাঙলা সাহিত্যের সবগুলি দিক তাঁর রচনার দ্বারা পুষ্ট ও পরিণত হয়েছে। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই আগষ্ট (২২শে শ্রাবণ) তিনি দেহত্যাগ করেন।

এই গল্পটি তাঁর 'মেঘ ও রৌদ্র' নামক বিখ্যাত ছোটগল্প থেকে নেওয়া হয়েছে।]

শশিভূষণ জিনিসপত্র বাঁধিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় কোন কাজ নাই, সেখানে যাওয়ার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নাই, সেইজন্য রেলপথে না গিয়া বরাবর নদীপথে যাওয়াই স্থির করিলেন।

তখন পূর্ণবর্ষায় বাংলাদেশের চারিদিকেই ছোটো-বড়ো আঁকাবাঁকা সহস্র জলময় জাল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সরস শ্যামল বঙ্গভূমির শিরা-উপশিরাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া তরুলতা, তৃণগুল্ম, ঝোপ-ঝাড়, ধান

পাট, ইক্ষুতে দশদিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য যেন একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে।

শশিভূষণের নৌকা সেই সমস্ত সংকীর্ণ বক্র জলস্রোতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। জল এখন তীরের সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। কাশবন, শরবন এবং স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আমবাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—দেবকন্যারা যেন বাংলাদেশের তরুমূলবর্তী আলবালগুলি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার আরম্ভকালে স্নানচিক্কণ বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাস্যময় ছিল, অনতিবিলম্বেই মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এখন যেদিকে দৃষ্টি পড়ে সেই দিকই বিষণ্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। বন্যার সময়ে গোরুগুলি যেমন জলবেষ্টিত মলিন পঙ্কিল সংকীর্ণ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণের মধ্যে ভিড় করিয়া করুণনেত্রে সহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া শ্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজিতে থাকে, বাংলাদেশে আপনার কর্দমপিচ্ছিল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে মূক বিষণ্ণমুখে সেইরূপ পীড়িতভাবে অবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাষীরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে; স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতল বায়ুতে সংকুচিত হইয়া কুটীর হইতে কুটীরান্তরে গৃহকার্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিছল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্তবস্ত্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ পুরুষেরা দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, নিতান্ত কাজের দায় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া জুতাহস্তে ছাতি মাথায় বাহির হইতেছে—অবলা রমণীর মস্তকে ছাতি এই রৌদ্রদগ্ধ বর্ষাপ্লাবিত বঙ্গদেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।

বৃষ্টি যখন কিছুতেই থামে না তখন রুদ্ধ নৌকার মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া শশিভূষণ পুনশ্চ রেলপথে যাওয়াই স্থির করিলেন।

এক জায়গায় একটা প্রশস্ত মোহানার মতো জায়গায় আসিয়া শশিভূষণ নৌকা বাঁধিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে—সে কেবল খানার দোষে নয়, খোঁড়ার পা-টারও পড়িবার দিকে একটু বিশেষ ঝোঁক আছে। শশিভূষণ সেদিন তাহার প্রমাণ দিলেন।

দুই নদীর মোহানার মুখে বাঁশ বাঁধিয়া জেলেরা প্রকাণ্ড জাল পাতিয়াছে। কেবল একপার্শ্বে নৌকা চলাচলের স্থান রাখিয়াছে। বহুকাল হইতে তাহারা এ কার্য করিয়া থাকে এবং সেজন্য খাজনাও দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বৎসর এই পথে হঠাৎ জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের শুভাগমন হইয়াছে। তাঁহার বোট আসিতে দেখিয়া জেলেরা পূর্ব হইতে পার্শ্ববর্তী পথ নির্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু মনুষ্যরচিত কোনো বাধাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঘুরিয়া যাওয়া সাহেবের মাঝির অভ্যাস নাই। সে সেই জালের উপর দিয়াই বোট চালাইয়া দিল। জাল অবনত হইয়া বোটকে পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহার হাল বাধিয়া গেল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে এবং চেষ্টায় হাল ছাড়াইয়া লইতে হইল।

পুলিশ সাহেব অত্যন্ত গরম এবং রক্তবর্ণ হইয়া বোট বাঁধিলেন। তাঁহার মূর্তি দেখিয়াই জেলে চারটে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। সাহেব তাঁহার মাল্লাদিগকে জাল কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই সাত-আট শত টাকার বৃহৎ জাল কাটিয়া টুকরো টুকরো করিয়া ফেলিল।

জালের উপর ঝাল ঝাড়িয়া অবশেষে জেলেদিগকে ধরিয়া আনিবার আদেশ হইল। কন্‌স্টেবল্ পলাতক জেলে চারিটির সন্ধান না পাইয়া যে চারিজনকে হাতের কাছে পাইল তাহাদিগকে ধরিয়া আনিল। তাহারা আপনাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া জোড় হস্তে কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল। পুলিশবাহাদুর যখন সেই বন্দীদিগকে সঙ্গে লইবার হুকুম দিতেছেন, এমন সময় চশমাপরা

শশিভূষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পরিয়া তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটিজুতা চট্‌চট্‌ করিতে করিতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পুলিশের বোটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন, "সার, জেলের জাল ছিঁড়িবার এবং এই চারিজন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার কোনো অধিকার নাই।"

পুলিশের বড়োকর্তা তাঁহাকে হিন্দী ভাষায় একটা বিশেষ অসম্মানের কথা বলিবামাত্র তিনি এক মুহূর্তে কিঞ্চিৎ উচ্চ ডাঙা হইতে বোটের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপরে আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মতো, পাগলের মতো মারিতে লাগিলেন।

তাহার পর কী হইল তিনি জানেন না। পুলিশের থানার মধ্যে যখন জাগিয়া উঠিলেন তখন, বলিতে সংকোচ বোধ হয়, যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে মানসিক সম্মান অথবা শারীরিক আরাম বোধ করিলেন না।

* * *

শশিভূষণের বাপ উকিল-ব্যারিস্টার লাগাইয়া প্রথমত শশীকে হাজত হইতে জামিনে খালাস করিলেন। তাহার পরে মোকদ্দমার জোগাড় চলিতে লাগিল।

যে সকল জেলের জাল নষ্ট হইয়াছে তাহারা শশিভূষণের এক পরগনার অন্তর্গত, এক জমিদারের অধীন। বিপদের সময় কখনো কখনো শশীর নিকটে তাহারা আইনের পরামর্শ লইতেও আসিত। যাহাদিগকে সাহেব বোটে ধরিয়া আনিয়াছিলেন তাহারাও শশিভূষণের অপরিচিত নহে।

শশী তাহাদিগকে সাক্ষী মানিবেন বলিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া যাহাদিগকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হয় পুলিশের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা কোথায় গিয়া নিষ্কৃতি পাইবে? একটার অধিক

প্রাণ কাহার শরীরে আছে? যাহা লোকসান হইবার তাহা তো হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষীর সপিনা ধরাইয়া এ কী মুশকিল! সকলে বলিল, "ঠাকুর তুমি তো আমাদিগকে বিষম ফেসাদে ফেলিলে।"

বিস্তর বলা-কহার পর তাহারা সত্যকথা বলিতে স্বীকার করিল।

ইতিমধ্যে হরকুমার যেদিন বেঞ্চের কর্মোপলক্ষে জেলার সাহেবদিগকে সেলাম করিতে গেলেন পুলিশ সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "নায়েববাবু, শুনিতেছি তোমার প্রজারা পুলিশের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।"

নায়েব সচকিত হইয়া কহিলেন, "হ্যাঁ! এও কি কখনো সম্ভব হয়? অপবিত্র জন্তুজাত পুত্রদিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা?"

সংবাদপত্র-পাঠকেরা অবগত আছেন, মোকদ্দমায় শশিভূষণের পক্ষ কিছুতেই টিঁকিতে পারিল না।

জেলেরা একে একে আসিয়া কহিল, পুলিশ সাহেব তাহাদের জাল কাটিয়া দেন নাই, বোটে ডাকিয়া তাহাদের নাম-ধাম লিখিয়া লইতেছিলেন।

কেবল তাহাই নহে, তাঁহার দেশস্থ গুটিচারেক পরিচিত লোক সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা সে সময়ে ঘটনাস্থলে বিবাহের বরযাত্র উপলক্ষে উপস্থিত ছিল। শশিভূষণ যে অকারণে অগ্রসর হইয়া পুলিশের পাহারাওয়ালাদের প্রতি উপদ্রব করিয়াছে, তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে।

শশিভূষণ স্বীকার করিলেন যে, গালি খাইয়া বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সাহেবকে মারিয়াছেন। কিন্তু জাল কাটিয়া দেওয়া ও জেলেদের প্রতি উপদ্রবই তাহার মূল কারণ।

এরূপ অবস্থায়, যে বিচারে শশিভূষণ শাস্তি পাইলেন তাহাকে অন্যায় বলা যাইতে পারে না। তবে শাস্তিটা কিছু গুরুতর হইল।

তিন-চারিটা অভিযোগ, আঘাত, অনধিকার প্রবেশ, পুলিশের কর্তব্যে ব্যাঘাত ইত্যাদি, সব কটাই তাঁহার বিরুদ্ধে পুরা প্রমাণ হইল।

শশিভূষণ পাঁচ বৎসর জেল খাটিতে গেলেন।

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। শশিভূষণ কোন্ কালে যাত্রা করেন? সেইকালে বাংলাদেশের রূপ সাধারণতঃ কেমন হয়? শশিভূষণ কেমন কেমন রূপ পরিবর্তন দেখলেন? [১+৪+৫]

২। কোথায় জাল পাতা ছিল? জাল পাতা কি অন্যায় হয়েছিল? নৌকা যাবার সাধারণ রীতি কি ছিল? পুলিশের সঙ্গে জেলেদের বিরোধ বাধল কেন? এ বিরোধ সহজে মিটল না কেন? পরিণতি কি হ'ল? [১+২+১+২+২+২]

৩। শশিভূষণের চরিত্র ও কাহিনীর ঘটনাগুলি বর্ণনা করে বুঝিয়ে দাও, কেন শশিভূষণকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। [৫×২=১০]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৪। 'ঘোঁড়ার পা থানায় পড়ে।'—অর্থ কি? গল্পের সঙ্গে সঙ্গতি কোথায়? [২+২]

৫। 'তাহারা ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল।' কখন কারা ভয়ে অস্থির হ'ল? কি কি ভয় করল তারা? [২+২]

॥ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ॥

৬। সেখানে যাওয়ার······স্থির করিলেন।—আলোচ্য অংশ কার লেখা, কোন্ রচনার অংশ? কে এমন যাওয়া স্থির করেন? এমন স্থির করবার কারণ কি? [২+৩+৩]

৭। গ্রামের বেড়া বাঁশঝাড়······পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।—লেখক ও রচনার নাম এবং প্রসঙ্গ বর্ণনা কর। জলের ধারে 'এসে দাঁড়ালির' তাৎপর্য কি? দেবকন্যাদের কল্পনা করা হয়েছে কেন? [৩+৩+২]

৮। অবলা রমণীর····· প্রথার মধ্যে নাই।—কার লেখা, কোন্ রচনা থেকে উদ্ধৃত? এ কার মন্তব্য? বঙ্গদেশের বিশেষণ দুটি কেন? সনাতন প্রথা কি। মূল রসিকতা বুঝিয়ে দাও।

[২+১+২+১+২]

৯। অপবিত্র জন্তুজাত......এত ক্ষমতা!—প্রসঙ্গ বল। কে কখন এ কথা বলেছিল? তাৎপর্য বল। [৩+২+৩]

১০। এইরূপ অবস্থায়····· বলা যাইতে পারে না।—কোথায় এ মন্তব্য করা হয়েছে? মূল ঘটনা কি? শাস্তির কারণ বর্ণনা কর। এর দ্বারা কোন্ সত্য উদ্ঘাটিত হয়? [২+৩+২+১]

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

১১। অর্থ লিখ: অব্যবহিত, তরুমূলবর্তী, আলবাল, স্নানচিক্কন, বনশ্রী, গোষ্ঠপ্রাঙ্গণ, কর্দম-পিচ্ছিল, টোকা, সনাতন, খাজনা, মাল্লা, হাজত, জামিন, খালাস, সপিনা।

১২। ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম বল: জলমগ্ন, স্নানচিক্কন, জলবেষ্টিত, কর্দম-পিচ্ছিল, কুটীরাস্তর, দেশস্থ, প্রত্যক্ষ।

১৩। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: উচ্ছৃঙ্খল, অত্যন্ত, পুনশ্চ. শুভাগমন, নিরপরাধ, কর্মোপলক্ষে, ব্যাঘাত।

১৪। পদ পরিবর্তন কর: প্রাচুর্য, বিষণ্ণ, পঙ্কিল, রুদ্ধ, সংকুচিত, প্লাবিত, রচিত, অভ্যাস, অবনত, কম্পিত, উৎপীড়ন।

১৫। বাক্য রচনা কর: কাজের দায়, খোঁড়ার পা খানায় পড়ে, দুর্ভাগ্যক্রমে, গরম হাওয়া, ঝাল-ঝাড়া, হাতের কাছে পাওয়া, কাকুতি মিনতি, ফেসাদে ফেলা, বলা কহা, নাম-ধাম।

বর্ষার প্রভাব

শ্রী প্রমথ চৌধুরী

[বাঙলা চলতি গদ্যকে সাহিত্যের আসরে রাজমর্যাদায় বসাতে যাঁরা রীতিমত আন্দোলনে নেমেছিলেন, প্রমথ চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। 'সবুজ-পত্র' নামক পত্রিকাই ছিল তাঁর হাতিয়ার। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে ছিলেন চৌধুরী মশাই-এর সহযোগী। বীরবল ছদ্মনামেও ইনি লিখতেন।

১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে পাবনা জেলার হরিপুরে এঁর জন্ম হয়। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর দেহান্তর ঘটে।]

আজ সকাল থেকে উঠে দেখি যে, যেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমগ্র আকাশ বর্ষায় ভরে গিয়েছে। মাথার উপর থেকে অবিরাম অবিরল অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টির ধারা পড়ছে। সে ধারা এত সূক্ষ্ম নয় যে চোখ এড়িয়ে যায়, অথচ এত স্থূলও নয় যে তা চোখ জুড়ে থাকে। আর কানে আসছে তার একটানা আওয়াজ ; সে আওয়াজ কখনো মনে হয় নদীর কুল কুলু ধ্বনি, কখনো মনে হয় তা পাতার মর্মর। আসলে তা একসঙ্গে ও দুই-ই ; কেননা আজকের দিনে জলের স্বর ও বাতাসের স্বর দুই মিলে-মিশে এক সুর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমন দিনে মানুষের মন যে অন্যমনস্ক হয় তার কারণ সকল মন তার চোখ আর কানে এসে ভর করে। আমাদের এই চোখ

পোড়ানো আলোর দেশে বর্ষার আকাশ আমাদের চোখ কি যে অপূর্ব স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দেয় তা বাঙালী মাত্রেই জানে। আজকের আকাশ দেখে মনে হয়, ছায়ার রঙের কোনো পাখির পালক দিয়ে বর্ষা তাকে আগাগোড়া মুড়িয়ে দিয়েছে, তাই তার স্পর্শ আমাদের চোখের কাছে এত নরম, এত মোলায়েম।

তারপর চেয়ে দেখি গাছপালা মাঠঘাট সবারই ভিতর যেন একটা নূতন প্রাণের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। সে প্রাণের আনন্দে নারকেল গাছগুলো সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুলছে, আর তাদের মাথার ঝাঁকড়া চুল কখনো-বা এলিয়ে পড়ছে, কখনো-বা জড়িয়ে যাচ্ছে। আর পাতার চাপে যেসব গাছের ডাল দেখা যায় না, সেসব গাছের পাতার দল এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছে, পরস্পর কোলাকুলি করছে; কখনো-বা বাতাসের স্পর্শে বেঁকেচুরে এমন আকার ধারণ করছে যে দেখলে মনে হয় বৃক্ষলতা সব পত্রপুটে ফটিক জল পান করছে। আর এই খামখেয়ালি বাতাস নিজের খুশিমত একবার পাঁচ মিনিটের জন্য লতাপাতাকে নাচিয়ে দিয়ে বৃষ্টির ধারাকে ছড়িয়ে দিয়ে আবার থেমে যাচ্ছে। তারপর আবার সে ফিরে এসে যা ক্ষণকালের জন্য স্থির ছিল তাকে আবার ছুঁয়ে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, সে যেন জানে যে তার স্পর্শে যা-কিছু জীবন্ত অথচ শান্ত সে সবই প্রথমে কেঁপে উঠবে; তারপর ব্যতিব্যস্ত হবে, তারপর মাথা নাড়বে, তারপর হাত-পা ছুঁড়বে; আর জলের গায়ে ফুটবে পুলক আর তার মুখে সীৎকার। বৃষ্টির সঙ্গে বৃক্ষ পল্লবের সঙ্গে সমীকরণের এই লুকোচুরি খেলা আমি চোখ ভরে দেখছি আর কান পেতে শুনছি। মনের ভিতর আমার এখন আর কোনো ভাবনা চিন্তা নেই, আছে শুধু এমন একটা অনুভূতি যার কোনো স্পষ্ট রূপ নেই, কোনো নির্দিষ্ট নাম নেই।

আনন্দে-বিষাদে মেশানো ঐ অনামিক অনুভূতির জমির উপর অনেক ছোটখাট ভাব মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠেছে, আবার মুহূর্তেই তা মিলিয়ে যাচ্ছে। এই বর্ষার দিনে কত গানের সুর আমার কানের

কাছে গুন গুন করছে, কত কবিতার শ্লোক, কখনো পুরোপুরি কখনো আধখানা হয়ে আমার মনের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজকে আমি ইংরেজি ভুলে গিয়েছি। যে সব কবিতা, যে সব গান আজ আমার মনে পড়েছে সে সবই হয় সংস্কৃত, নয় বাংলা, নয় হিন্দী।

[সংক্ষেপিত]

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। বাংলাদেশে বর্ষারবৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? তা মানুষ ছাড়া আর কাদের কি ভাবে আকুল করে? [৫+৫]

২। বর্ষার আগমনে লেখকের মনে কি কি ভাব-অনুভাব জেগে উঠেছে? [১০]

৩। লেখকের মনে বর্ষার প্রভাব বর্ণনা কর। [১০]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৪। "তা বাঙালীমাত্রেই জানে'......কি জানে?

৫। "সবারই ভিতর যেন একটা নূতন প্রাণের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে"... কিভাবে?

(গ) "আমি চোখ ভরে দেখছি আর কান পেতে শুনছি"......লেখক কি দেখছেন, কি শুনছেন?

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৫। অর্থ বল: অবিরাম, অবিরল, অবিচ্ছিন্ন, মর্মর, হিল্লোল, পত্রপুট, সীৎকার, অনামিক।

৬। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ:—সূক্ষ্ম, অন্যমনস্ক, শান্ত, নির্দিষ্ট।

বৃহত্তর ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[বাঙলা ভাষা, বাঙলা-সাহিত্য, ও বাঙলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আচার্য সুনীতিকুমারের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ভারতীয় ভাষা-সমূহের বিজ্ঞানসম্মত তুলনামূলক আলোচনা শুরু করেন। তাঁর Origin and Development of Bengali Language and Literature একটি বিখ্যাত গ্রন্থ।

সুনীতিকুমার ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।]

এশিয়া-মহাদেশের প্রধানতঃ তিনটি স্থানে 'বৃহত্তর ভারত' গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই তিনটি স্থানের নামকরণ হইয়াছে—১। ইন্দোনেশিয়া বা দ্বীপময় 'ভারত' ২। ইন্দোচীন এবং ৩। সেরিন্দিয়া। এতদ্ভিন্ন আফগানিস্থান এবং তিব্বতকেও বৃহত্তর ভারতের মধ্যে ধরিতে হয় এবং সিংহল দ্বীপকে বৃহত্তর ভারতের অংশ অপেক্ষা মূল ভারতবর্ষেরই অংশস্বরূপ ধরিতে হয়।

সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ, লম্বক প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপ লইয়া ইন্দোনেশিয়া বা দ্বীপময় ভারত গঠিত। প্রাচীনকালে সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বালিদ্বীপ এই তিনটি স্থানই ছিল হিন্দু-সভ্যতার কেন্দ্র। এই যবদ্বীপেই চার কোটি লোকের বাস। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ

আমাদের ভারতীয় হিন্দুদিগের মত হিন্দু ছিল। প্রায় চারিশত বৎসর হইতে একটু একটু করিয়া ইহারা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন ইহারা নামে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলেও, নিজেদের প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতা ও মনোভাব ত্যাগ করে নাই। এখনও ইহারা ইহাদের হিন্দু পিতৃপুরুষগণের কীর্তির কথা লইয়া গর্ব করে, সারারাত্রি রামায়ণ-মহাভারতের নাটক অভিনয় ও পুতুলনাচ করে এবং সংস্কৃত ভাষার নাম ব্যবহার করে। আগে দেশের লোকেরা ও রাজারা আমাদের মতন হিন্দু নাম লইতেন, রাজারাও সংস্কৃত ভাষায় অনুশাসন প্রচার করিতেন।

ইন্দোচীন শব্দ দ্বারা আজকাল মুখ্যতঃ ফরাসীদের অধীন French-Indo-China-কেই বুঝায়। কিন্তু ব্যাপকভাবে এই নাম দ্বারা বর্মা ও শ্যামকেও বুঝাইয়া থাকে। ফরাসীদের অধিকৃত ইন্দোচীনে—টংকিং, আনাম, কোচিন-চীন, কাম্বোডিয়া বা কম্বোজ এবং লাওস—এই কয়টি দেশ আছে। টংকিং ও আনামের উপর চীনের সভ্যতার প্রভাবই বেশী, কিন্তু কোচিন-চীন এবং কম্বোজ রাজ্য বৃহত্তর ভারতের দুইটি বিশিষ্ট অংশ ছিল। কোচিন-চীনের প্রাচীন নাম ছিল চম্পা। শ্যাম ও বর্মা—এই দুই দেশে ভারতীয় হিন্দুসভ্যতাই প্রবল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম এ দেশের প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম।

বর্মা, শ্যাম ও কম্বোজের লোকেরা এখনও ধর্মে বৌদ্ধ, তাহাদের শাস্ত্রগ্রন্থ পালি ভাষায় লেখা। পালি এবং সংস্কৃত এই দুই ভাষারই চর্চা ঐ দুই দেশে এখনও কিছু কিছু আছে। শ্যামের ভাষায় প্রচুর সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত হইয়া আছে, দেশের বহু স্থানের নামে, মানুষের নামে—সর্বত্রই সংস্কৃতের ছড়াছড়ি।

ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন—এই দুই স্থানে ভারতীয় প্রভাব খুব বেশী করিয়া সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই দুই স্থানের লোকেদের উপর প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোন দেশের প্রভাব পড়ে নাই বলিলেও চলে ; শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, যবদ্বীপ ও বালিদ্বীপ—

প্রাচীনকালে এগুলি যেন মহারাষ্ট্র, বঙ্গদেশ, দ্রাবিড়দেশ প্রভৃতির মত ভারতবর্ষেরই অংশস্বরূপ হইয়া গিয়াছিল।

যে দেশের প্রাচীন্ সভ্যতার কথা মনে করিয়া আমরা এখন সেরিন্দিয়া বলিতেছি, সেই দেশ এখন মুখ্যতঃ রুশ তুর্কিস্তান ও চীনা তুর্কিস্তান—এই তুই খণ্ডে বিভক্ত। চীন ও ভারত এই তুই দেশের সভ্যতা আসিয়া এই দেশে মিশিয়াছিল। এই দেশের লোকেরা এককালে বৌদ্ধধর্ম, ভারতীয় বর্ণমালা এবং সভ্যতা গ্রহণ করিয়া মধ্য-এশিয়ায় উপনিবিষ্ট ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিয়া একটা ছোটখাটো বৃহত্তর ভারতের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেরিন্দিয়ায় বহু বৌদ্ধ মঠ ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ ঐ দেশের মরুভূমির বালির নীচে হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতের সভ্যতার নিদর্শন হইতেছে বৌদ্ধ ও অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্রের সংস্কৃত পুঁথি, ছবি, মূর্তি ইত্যাদি। বালি খুঁড়িয়া প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শিল্পকলাদির প্রচুর নিদর্শন ঐ অঞ্চল হইতে বাহির হইয়াছে।

আজকাল যে দেশকে আমরা আফগানিস্থান বলি, দেড় হাজার বৎসর পূর্বে সেই দেশে হিন্দুধর্মের প্রচুর নিদর্শন ছিল। কাবুল শহরের ত্রিশ মাইল পশ্চিমে 'বামিয়ান' বা 'ব্রহ্মযান' নামক স্থানে পাহাড়ের গা কাটিয়া তৈয়ারী কতকগুলি বিরাট বৌদ্ধ-মূর্তি বাহির হইয়াছে। সেগুলি খাড়াইয়ে এক-একটা কলিকাতার মনুমেণ্টের চেয়েও উঁচু। এইগুলি ছাড়া আফগানিস্থানে বহু মান্দর, চিত্র, মূর্তি —বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের নিদর্শন বাহির হইয়াছে। সুপ্রাচীন যুগে এ দেশ ভারতেরই অঙ্গস্বরূপ ছিল, কিন্তু এক্ষণে এ দেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

ভারতের উত্তরের দেশ তিব্বতকে এক হিসাবে বৃহত্তর ভারতের সামিল করিয়া লওয়া চলে। জাতিতে তিব্বতীরা চীনাদের জ্ঞাতি। কিন্তু ধর্মে ও সভ্যতায় ইহারা অনেকটা ভারতেরই।

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে কয়েকজন পণ্ডিত

প্রাচীনকালে তিব্বত গিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য হইতেছেন বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ'।

বৃহত্তর ভারতে ভারতীয়দিগের তিনটি বড় বড় কীর্তি আছে। এই কীর্তি তিনটি হইতেছে তিনটি বিরাট মন্দির—একটি কম্বোজে অবস্থিত, বাকী দুইটি যবদ্বীপে অবস্থিত। কম্বোজের মন্দিরটি আঙ্কোরভাটের মন্দির নামে খ্যাত, যবদ্বীপের একটি মন্দির বর্‌বুদুর নামে বিখ্যাত। ইহা একটি বিরাট বৌদ্ধস্তূপ। তৃতীয়টি যবদ্বীপের অন্তর্গত প্রাম্বানানের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মন্দির।

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। বৃহত্তর ভারত বলতে কি বোঝ? কোন্ কোন্ দেশ বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত? সিংহল সম্পর্কে কি ভাবা হত? [৪+৪+২]

২। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি কোথায় কোথায় সঞ্চারিত হয়েছিল, উদাহরণ, নিদর্শন ও স্থানগুলির নাম উল্লেখপূর্বক লেখ। [১০]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৩। টীকা লেখ: এশীয় মহাদেশ, সেরিন্দিয়া, কলকাতার মনুমেণ্ট, আঙ্কোরভাট, বরবুদুর, অতীশ শ্রীজ্ঞান।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৪। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: বৃহত্তর, মনোভাব, বিচ্ছিন্ন, অন্তর্গত, ধ্বংসাবশেষ।

৫। পদপরিবর্তন কর: অধিকৃত, :প্রবল, আধুনিক, মিশ্রিত, প্রচুর, বিচ্ছিন্ন।

৬। সমাস বল: মহাদেশ, দ্রাবিড়দেশ, মরুভূমি, সুপ্রাচীন।

অন্ধকারের রূপ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[বাঙলা সাহিত্যের এক অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিম-পরবর্তী ঔপন্যাসিকেরা যখন কাল্পনিক কাহিনীর আসর জমিয়ে রেখেছেন তখন শরৎচন্দ্র এলেন তাঁর বহু বিস্তৃত অভিজ্ঞতা আর দরদী মন নিয়ে। এক মুহূর্তে দেশের মন জয় করে নিলেন তিনি।

১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে ১৫ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারী লোকান্তরিত হন।

আলোচ্য অংশটি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'শ্রীকান্ত'-র প্রথম পর্ব থেকে নেওয়া হয়েছে।]

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন এই আজ প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব-চরাচর মুখ বুজিয়া, নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপর যেন সৌন্দর্য-তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্

মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এত বড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে? এই যে আকাশ-বাতাস—স্বর্গ-মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ, অগম্য গহন অরণ্যানী আঁধার; সর্বলোকাশ্রয় আলোর, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না,—যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না, তাহাই তত অন্ধকার। মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন; কখনও এ সকল কথা ভাবি নাই, কোন দিন এ পথে চলি নাই। তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশানপ্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকিত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং অকস্মাৎ মনে হইল কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোনদিন জানি নাই। তবে হয়ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয়ত তার এমনি অফুরন্ত সুন্দর রূপে আমার দু'চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।

কতক্ষণ যে এখানে এইভাবে স্থির হইয়াছিলাম, তখন হুঁশ ছিল না। হুঁশ হইলে দেখিলাম, তেমন অন্ধকার আর নাই—আকাশের একপ্রান্ত যেন স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে; এবং তাহারই অদূরে শুকতারা দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। এক চাপা কথাবার্তার কোলাহল কানে গেল। ঠাহর করিয়া দেখিলাম, দূরে শিমুল গাছের আড়ালে বাঁধের উপর দিয়া কাহারা যেন চলিয়া আসিতেছে; এবং তাহাদের দুই-চারিটা লণ্ঠনের আলোকও আশেপাশে ইতস্ততঃ

জ্বলিতেছে। পুনর্বার বাঁধের উপর উঠিয়া সেই আলোকেই দেখিলাম, ছু'খানা গরুর গাড়ীর অগ্র-পশ্চাৎ জনকয়েক লোক এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বুঝিলাম, কাহারা এই পথে স্টেশনে যাইতেছে।

মাথায় সুবুদ্ধি আসিল যে, পথ ছাড়িয়া আমার দূরে সরিয়া যাওয়া আবশ্যক; কারণ আগন্তুকের দল যত বুদ্ধিমান এবং সাহসীই হোক, হঠাৎ এই অন্ধকার রাত্রিতে এরূপ্ স্থানে আমাকে একাকী ভূতের মত দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে, আর কিছু না করুক, একটা যে বিষম হৈ-হৈ রৈ-রৈ চীৎকার তুলিয়া দিবে, তাহাতে আর সংশয় নাই—ফিরিয়া আসিয়া পূর্বস্থানে দাঁড়াইলাম।

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। লেখক কখন পুরোন দীঘির ঘাটে বসেছিলেন? দীঘিটি কোথায় ছিল? ঐ সময় তাঁর মানসিক অবস্থার বর্ণনা দাও। [২+২+৬]

২। কোন অবস্থায় লেখক অন্ধকারের রূপ প্রত্যক্ষ করেন? তিনি আলোর রূপের সঙ্গে অন্ধকারের রূপের কি পার্থক্য বোঝেন? তাঁর ঐ সময়ের চিন্তার পরিচয় দাও। [৩+২+৫]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৩। 'এক চাপা কথাবার্তার কোলাহল কানে গেল।' কাদের কথাবার্তা? [৩]

৪। 'মাথায় সুবুদ্ধি আসিল।' সুবুদ্ধি কি? একে সুবুদ্ধি বলার কারণ কি? [২+২]

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৫। সমাস লেখ: সৌন্দর্যতরঙ্গ, মসীকৃষ্ণ, সুবুদ্ধি।

৬। সন্ধি বল: ভয়াকীর্ণ, স্বচ্ছ।

৭। বাক্যে ব্যবহার কর: দপদপ। হৈ হৈ রৈ রৈ। চরাচর।

স্বদেশী যুগের স্মৃতি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী—চিত্রশিল্পী। তিনি ছবি আঁকেন। তাই তাঁর লেখাও ছবি আঁকা। সামান্য কথার আঁচড়ে গোটা ছবি ফুটিয়ে তোলাই তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। তাঁর ছবিগুলির মধ্যে 'নির্বাসিত যক্ষ', 'সাজাহানের মৃত্যু', 'বুদ্ধ ও সুজাতা', ইত্যাদি বিখ্যাত। তাঁর নালক, রাজ ক্যাহিনী, বুড়ো আংলা, ক্ষীরের পুতুল ইত্যাদি বইগুলির কিশোরদের চিরপ্রিয়। বর্তমান প্রবন্ধ নেওয়া হয়েছে তাঁর 'ঘরোয়া' নামক গ্রন্থ থেকে। বইটি আসলে অবনীন্দ্রনাথ মুখে বলে যান, লিখে নেন রাণী চন্দ।]

একসময়ে হঠাৎ দেখি সবাই স্বদেশী হুজুগে মেতে উঠেছে। এই স্বদেশী হুজুগটা যে কোথা থেকে এল কেউ আমরা তা বলতে পারি নে। এল এইমাত্র জানি, আর তাতে ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, বড়োলোক, মুটে-মজুর, সবাই মেতে উঠেছিল। সবার ভেতরেই যেন একটা তাগিদ এসেছিল। কিন্তু কে দিলে এই তাগিদ। সবাই বলে, হুকুম আয়া। আরে, এই হুকুমই বা দিলে কে, কেন? তা জানে না কেউ, জানে কেবল—হুকুম আয়া। তাই মনে হয় এটা সবার ভেতর থেকে এসেছিল। আমি এখনো ভাবি, এ একটা রহস্য। বোধহয় ভূমিকম্পের পরে একটা বিষম নাড়াচাড়ায়—সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। বড়ো-ছোটো, মুটে-মজুর সব যেন এক ধাক্কায় জেগে উঠল।

তখন স্বদেশীর একটা চমৎকার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল দেশের উপর দিয়ে। এমন একটা ঢেউ যাতে দেশ উর্বরা হতে পারত, ভাঙত না কিছু। সবাই দেশের জন্য ভাবতে শুরু করলে—দেশকে নিজস্ব কিছু দিতে হবে, দেশের জন্য কিছু করতে হবে। আমাদের দলের পাণ্ডা ছিলেন রবিকাকা। আমরা সব একদিন জুতোর দোকান খুলে বসলুম। বাড়ির বুড়ো সরকার খুঁতখুঁত করতে লাগল, বলে, বাবুরা ওটা বাদ দিয়ে স্বদেশী করুন না—জুতোর দোকান খোলা, ও-সব কেন আবার। মস্ত সাইনবোর্ড টাঙানো হল দোকানের সামনে—"স্বদেশী ভাণ্ডার"। ঠিক হল স্বদেশী জিনিস ছাড়া আর কিছু থাকবে না দোকানে। বলু খুব খেটেছিল—নানা দেশ ঘুরে যেখান যা স্বদেশী জিনিস পাওয়া যায়—মায় পায়ের আলতা থেকে মেয়েদের পায়ের জুতো সব-কিছু জোগাড় করেছিল, তার ওই শখ ছিল। পুরোদমে দোকান চলছে। শুধু কি দোকান—জায়গায় জায়গায় পল্লীসমিতি গঠন হচ্ছে। প্লেগ এল, সেবা সমিতি হল, তাতে সিস্টার নিবেদিতা এসে যোগ দিলেন। চারিদিক থেকে একটা সেলফ্-স্যাকরিফাইসের ও একটা আত্মীয়তার ভাব এসেছিল সবার মনে।

পশুপতিবাবুর বাড়ি যাচ্ছি, মাতৃভাণ্ডার সৃষ্টি হবে—ন্যাশন্যাল ফণ্ড—টাকা তুলতে হবে। ঘোড়ার গাড়ির ছাদের উপর মস্ত টিনের ট্রাঙ্ক, তাতে সাদা রঙে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা—মাতৃভাণ্ডার। সবাই চাঁদা দিলে—একদিনে প্রায় পঞ্চাশ-যাট হাজার টাকা উঠে গিয়েছিল মায়ের ভাণ্ডারে। অনেক সাহেবসুবোও ব্যাপার দেখতে ছুটেছিল, তারাও টুপি উড়িয়ে বন্দেমাতরম্ রব তুলেছিল থেকে থেকে। তারা পুলিশের লোক কি খবরের কাগজের রিপোর্টার তা কে জানে।

রামকেষ্টপুরের রেলের কুলিরা খবর দিলে, বাবুরা যদি আসেন আমাদের কাছে তবে আমরাও টাকা দেব। আমরা রবিকাকা

সবাই ছুটলুম। তখন বর্ষাকাল—একটা টিনের ঘরে আমাদের আড্ডা হল। এক মুহুরি টাকা গুণে নিলে। অতটুকু টিনের ঘরে তো মিটিং হতে পারে না। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে—বাইরে সারি সারি রেলগাড়ির নীচে শতরঞ্জি বিছিয়ে বক্তৃতা হচ্ছে আর আমি ভাবছি—এই সময়েই যদি ইঞ্জিন এসে মালগাড়ি টানতে শুরু করে তবেই গেছি আর কি! এই ভাবতে ভাবতে এক কুলি এসে খবর দিলে সত্যিই একটা ইঞ্জিন আসছে। সবাই হুড়দাড় করে উঠে পড়লুম। শ-খানেক টাকা সেই কুলিদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম।

ভূমিকম্পের বছর সেটা, নাটোর গেলুম সবাই মিলে, প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স হবে। রবিকাকা প্রস্তাব করলেন, প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স বাংলা ভাষায় হবে—বুঝবে সবাই। আমরা ছোকরারা ছিলুম রবিকাকার দলে। বললুম, হ্যাঁ, এটা হওয়া চাই যে করে হোক। তাই নিয়ে চাঁইদের সঙ্গে বাধল—তাঁরা কিছুতেই ঘাড় পাতেন না। চাঁইরা বললেন, যেমন কংগ্রেসে হয় সব বক্তৃতা-টক্তৃতা ইংরেজিতে তেমনিই হবে প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স। প্যাণ্ডেলে গেলুম, এখন যে'ই বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ায় আমরা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি, বাংলা, বাংলা। কাউকে আর মুখ খুলতে দিই না। ইংরেজিতে মুখ খুললেই 'বাংলা', 'বাংলা' বলে চেঁচাই। শেষটায় চাঁইদের মধ্যে অনেকেই বাগ মানলেন। লালমোহন ঘোষ এমন ঘোরতর সাহেব, তিনি ইংরেজি ছাড়া কখনো বলতেন না বাংলাতে, বাংলা কইবেন এ কেউ বিশ্বাস করতে পারত না—তিনিও শেষে বাংলাতেই উঠে বক্তৃতা করলেন। কী সুন্দর বাংলায় বক্তৃতা করলেন তিনি, যেমন ইংরেজিতে চমৎকার বলতে পারতেন বাংলা ভাষায়ও তেমনি। অমন আর শুনি নি কখনো। যাক্ আমাদের তো জয়-জয়কার। বাংলা ভাষার প্রচলন হল কন্‌ফারেন্সে। সেই প্রথম আমরা বাংলা ভাষার জন্য লড়লুম।

একদিন রাজেন মল্লিকের বাড়ি থেকে ফিরছি পল্লীসমিতির

মিটিঙের পর, রাস্তার মোড়ে একটা মুটে মাথা থেকে মোট নামিয়ে সেলাম করে হাতে পয়সা কিছু গুঁজে দিলে, বললে, আজকের রোজগার। একদিনের সব রোজগার স্বদেশের কাজে দিয়ে দিলে। মুটে-মজুরদের মধ্যেও কেমন একটা ভাব এসেছিল স্বদেশের জন্য কিছু করবার, কিছু দেবার। [—সংক্ষেপিত]

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। লেখক কাকে স্বদেশী হুজুগ বলছেন? এ হুজুগের কি কি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন তিনি? স্বদেশী ভাণ্ডার কারা গড়েন? সেখানে কি বিক্রি হ'ত? সেবাসমিতি গঠিত হ'ল কেন? নিবেদিতার সঙ্গে যোগ হ'ল কখন? [২+২+১+২+১+২]

২। মাতৃভাণ্ডারে কিভাবে অর্থ সংগ্রহ হত? এই সংগ্রহে সবচেয়ে অবাক করা ঘটনা কি? কুলিরা কিভাবে সাহায্য করেছিল? [৪+২+৪]

৩। নটোরের প্রাদেশিক সভার বর্ণনা কর। এই হুজুগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমার ধারণা বল। [৫+৫]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৪। স্বদেশী ভাণ্ডারের বর্ণনা দাও।

৫। রামকৃষ্ণপুরের সভার বর্ণনা দাও।

৬। পল্লীসমিতি থেকে ফিরবার পথে কি ঘটনা ঘটেছিল?

৭। টীকা লেখ: সিস্টার নিবেদিতা। বুলু। লালমোহন ঘোষ।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৮। অর্থ লেখ ও বাক্যরচনা কর :—নিজস্ব, বরাভয়, অভ্যর্থনা, বর্জন।

৮। বিপরীত শব্দ লেখ: নিজস্ব। সৃষ্টি।

ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ ও মুক্তিযুদ্ধ

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

[বাঙলা দেশের কোন শিক্ষার্থীকে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। তিনি এক নামেই পরিচিত—তিনি 'নেতাজী'।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে ২৩ জানুয়ারী কটকে তাঁর জন্ম হয়। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্য তিনি গোপনে দেশত্যাগ করে সৈন্য বাহিনী গঠন করে ইংরাজ বাহিনীকে আক্রমণ করেন। ভারত সরকার যদিও এক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রচার করেন, তবু সাধারণ মানুষের বিশ্বাস নেতাজী আজও অ-মৃত।]

পলাশীর যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৭৫৭ সনে। এই যুদ্ধের ফলে বাংলার তৎকালীন স্বাধীন নৃপতি নবাব সিরাজদ্দৌলা ক্ষমতাচ্যুত হন। ব্রিটিশ শক্তির ভারত-বিজয় পর্ব এখান থেকেই শুরু হয়েছিল বটে, তবে ধীরে ধীরে এবং ক্রমানুসারী কয়েকটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়েই সে-কাজ অগ্রসর হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক শাসনাধিকারই ব্রিটিশ শক্তির হাতে এল, রাজনৈতিক শাসনাধিকার রইল নবাব মীরজাফরের হাতে। শেষ মুহূর্তে নবাব সিরাদ্দৌলার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ইনি ব্রিটিশ-পক্ষে যোগদান করেছিলেন। ক্রমিক কয়েকটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়েই বাংলার সামগ্রিক শাসনভার ব্রিটিশ-শক্তির হাতে এসেছে। ঠিক তেমনিভাবেই ধীরে ধীরে বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সম্প্রসারণ সম্ভব

হয়েছিল। ধীরগতিতে এইভাবে যখন একদিকে একটার পর একটা জায়গা দখলের কাজ চলছে, অন্যদিকে ব্রিটিশ-শক্তি তখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে দিল্লীশ্বরের আধিপত্য স্বীকার করে চলছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারত-বিজয়ের ব্যাপারে ব্রিটিশ-পক্ষ যে শুধু অস্ত্রশস্ত্রেরই সাহায্য গ্রহণ করেছিল তা নয়, উৎকোচ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং সর্বপ্রকার দুর্নীতি, এর কোনওটিকেই তারা বাদ দেয়নি। অস্ত্রের থেকে এগুলি আরও বেশী মারাত্মক।

আমাদের পূর্ববর্তীদের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভ্রান্তি এবং মূঢ়তা হলো এই যে, ভারতে আগত ব্রিটিশদের চরিত্র এবং কী ভূমিকা তারা গ্রহণ করবে তা তাঁরা গোড়াতেই বুঝতে পারেননি। অতীতকালে অসংখ্য উপজাতি ভারতবর্ষে এসে প্রবেশ করেছে, এবং পরে ভারতবর্ষকেই তাদের দেশ বলে গ্রহণ করেছে। আমাদের পূর্বপুরুষরা হয়তো ভেবেছিলেন যে, ব্রিটিশরাও ঠিক এমনই আর একটি উপজাতি। অনেক পরে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, ব্রিটিশরা শুধু রাজ্য-জয় আর লুণ্ঠন চালাতেই এদেশে এসেছে, বসবাস করতে আসেনি। সারা দেশের লোক সে-কথা বুঝতে পারা মাত্রই ১৮৫৭ সনে একটি বিরাট বিপ্লবের অভ্যুত্থান ঘটে। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা তাকে "সিপাহী বিদ্রোহ" আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাতে সত্যের বিকৃতি ঘটেছে। ভারতবাসীরা মনে করেন যে, এই বিপ্লবই হলো তাঁদের প্রথম মুক্তি সংগ্রাম। ১৮৫৭ সনের মহান বিপ্লবে ব্রিটিশরা এদেশ থেকে প্রায় বিতাড়িত হতে চলেছিল। কিন্তু খানিকটা তাদের উন্নততর রণ-নৈপুণ্যের জন্য এবং খানিকটা ভাগ্যক্রমে—শেষ পর্যন্ত তারা জয়লাভ করতে সমর্থ হলো। এরপর শুরু হলো এক বিভীষিকার অধ্যায়, ইতিহাসে এর তুলনা খুঁজে পাওয়া কঠিন। ব্যাপকভাবে হত্যাপর্ব অনুষ্ঠিত হতে লাগলো ; হাত-পা বেঁধে নির্দোষ নর-নারীকে কামানের মুখে উড়িয়ে দিয়ে হত্যা করতেও ব্রিটিশরা তখন পেছপা হয়নি।

১৮৫৭ সনের বিপ্লবের পর ব্রিটিশ-পক্ষ উপলব্ধি করতে পারল

যে, নিছক পশুশক্তির সাহায্যে খুব বেশীদিন ভারতবর্ষকে অধীন রাখা যাবে না। সুতরাং দেশকে তারা নিরস্ত্রীকৃত করতে অগ্রসর হলো। আমাদের পূর্ববর্তীদের দ্বিতীয় মারাত্মক ভ্রান্তি এবং মূঢ়তা হলো এই যে, সেই নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থার কাছে তাঁরা নতিস্বীকার করলেন। এত সহজে যদি তাঁরা তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ না করতেন তো ১৮৫৭ সনের পরবর্তী ইতিহাসের চেহারা হয়তো অন্যরকম হয়ে দাঁড়াত। গোটা দেশটাকে এইরকম পুরোপুরিভাবে নিরস্ত্রীকৃত করবার ফলেই ব্রিটিশ-শক্তির পক্ষে পরবর্তীকালে একটি সুদক্ষ এবং আধুনিক-কালোপযোগী ক্ষুদ্র সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ভারতবর্ষকে পদানত করে রাখা সম্ভবপর হয়েছে।

নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গেই নবপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সরকার, এ-সরকারের কার্যকলাপ তখন সরাসরি লণ্ডন থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তাঁদের "ভেদসৃষ্টির সাহায্যে শাসন পরিচালনা" নীতির প্রবর্তন করলেন। তখন থেকেই এই নীতির গোড়াপত্তন এবং ১৮৫৭ সন থেকে অদ্যাবধি এই নীতিটিই হলো ব্রিটিশ শাসনের মূল ভিত্তি। ১৮৫৭ সনের পর থেকে প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ এই নীতি অনুযায়ী ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশকে সরাসরি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে এবং বাকী এক-চতুর্থাংশকে দেশীয় নৃপতিবর্গের অধীনে রেখে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে রাখা হয়েছিল। সেইসঙ্গে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের বড় বড় জমিদারদের প্রতিও ব্রিটিশ সরকার যথেষ্টই পক্ষপাত প্রদর্শন করতে লাগলেন। ১৮৫৭ সনের পর দেশীয় নৃপতিদের প্রতি ব্রিটিশ সরকার যে মনোভাব দেখিয়ে এসেছেন, এ প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮৫৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত যেখানে যেখানে সম্ভব নৃপতিদের উচ্ছেদ করে তাঁদের রাজ্যগুলির প্রত্যক্ষ শাসন-ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করাই ছিল ব্রিটিশ সরকারের নীতি। ১৮৫৭ সনের বিপ্লবে ভারতীয় শাসকদের মধ্যে কয়েকজন—যথা ইতিহাস প্রসিদ্ধ শৌর্যশালিনী ঝাঁসীর রাণী—ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে

সংগ্রাম করেছিলেন বটে, তবে অনেকেই নিরপেক্ষ ছিলেন অথবা সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ-পক্ষে যোগদান করেছিলেন। এই শেষোক্তদের মধ্যে একজন হলেন নেপালের মহারাজা। সে-ই সর্বপ্রথম ব্রিটিশদের মাথায় ঢুকাল যে, নৃপতিবর্গকে অধিকারচ্যুত করাটা বোধ-হয় আর ঠিক হবে না ; তার চাইতে তাঁদের সঙ্গে বরং একটা মৈত্রী এবং বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করাই ভাল। তাতে করে ব্রিটিশ-শক্তি কখনও কোনও অসুবিধেয় পড়লে এই নৃপতিদের কাছ থেকে সাহায্য লাভ করা যাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বর্তমানে দেশীয় নৃপতিদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণে যে নীতি ব্রিটিশ-শক্তি গ্রহণ করেছে তার গোড়াপত্তন হয়েছে ১৮৫৭ সনে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে অবশ্য ব্রিটিশরা বুঝতে পারল যে, নিছক দেশীয় নৃপতিবর্গ এবং বড় বড় জমিদারকে জনসাধারণের বিরুদ্ধে ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করে আর ভারতবর্ষকে অধীন রাখা যাবে না। সুতরাং ১৯০৬ সনে তারা আবার এক মুসলিম-সমস্যার সৃষ্টি করল। লর্ড মিণ্টো তখন ভাইসরয়। এর আগে আর ভারতবর্ষে এরকম কোন সমস্যার অস্তিত্ব ছিল না। ১৮৫৭ সনের মহান বিপ্লবে হিন্দু এবং মুসলমানরা সম্মিলিতভাবেই ব্রিটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল। বাহাদুর শাহ্ মুসলমান ; কিন্তু তাঁরই পতাকাতলে সমবেত হয়ে ভারতবাসীরা তাদের প্রথম মুক্তি-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। ইংরাজেরা কি উদ্দেশ্য নিয়ে এদেশে এসেছিল? তাদের উদ্দেশ্য সেকালের লোকেরা কেন বুঝতে পারে নি? যখন সাধারণ মানুষ এই উদ্দেশ্য বুঝল, তখন কি করল? [৩+৫+২]

২। দেশীয় রাজাদের প্রতি ইংরাজদের মনোভাব প্রথমে কি ছিল? পরে পরিবর্তন হয় কেন? [৫+৫]

৩। দেশীয় পূর্বপুরুষদের প্রথম ও দ্বিতীয় ভুল ও মূঢ়তা কি কি? এই সব ভুল না হলে দেশের কি মঙ্গল হত? [৫+৫]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৪। টীকা লেখ: পলাশীর যুদ্ধ, সিরাজদ্দৌলা, লর্ড ক্লাইভ, হেষ্টিংস, সিপাহী বিদ্রোহ, ভেদ সৃষ্টির সাহায্যে শাসন পরিচালনা, দেশীয় নৃপতিবর্গ, ঝাঁসীর রাণী। [প্রতিটি ৩]

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৫। অর্থ লেখ: ক্রমানুসারী, শাসনাধিকার, সম্প্রসারণ, বিপ্লব রণনৈপুণ্য পশুশক্তি, নিরস্ত্রীকৃত, নতিস্বীকার, পক্ষপাত প্রদর্শন, শৌর্যশালিনী।

৬। সন্ধি বিচ্ছেদ কর: ক্রমানুসারী, শাসনাধিকার, দিল্লীশ্বর, সর্বাপেক্ষা, কালোপযোগী, অদ্যাবধি, চতুর্থাংশ, যথেষ্ট, উল্লেখ, উচ্ছেদ, শেষোক্ত।

ব্যাখ্যা লিখ:—

(ক) এইভাবে যখন একদিকে…স্বীকার করে বলেছে।

(খ) আমাদের পূর্বপুরুষেরা হয়'ত…আর একটি উপজাতি।

(গ) এত সহজে যদি তাঁরা…অন্যরকম হয়ে দাঁড়াত।

(ঘ) এর আগে আর ভারতবর্ষে এমন কোন সমস্যার অস্তিত্ব ছিল না।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

[চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য একজন শিক্ষাবিদ্। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। পরে বিশ্বভারতীর সাথে যুক্ত হন। তিনি সহজ ভাষায় জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় লিখে তরুণদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল বাড়িয়ে তুলবার জন্য আজীবন লিখেছেন।

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে তিনি লোকান্তরিত হন।]

একস্-রশ্মির আবিষ্কারক রন্‌টশেনের নাম আজ জগৎবিখ্যাত। তাঁর এই খ্যাতির সূচনা ছিল তাঁর দুটি খেয়ালে,—একটি ফটোগ্রাফি চর্চা আর একটি কাচের নল গলিয়ে তার বিভিন্ন রূপ দেওয়া।

১৮৪৫ সালে প্রুশিয়ার এক শহরে রন্‌টশেন জন্মগ্রহণ করেন। জুরিকে অধ্যাপক কুণ্ডের কাছে তিনি লেখাপড়া শেখেন, পরে তাঁর গুরুর সহকারী রূপে নিযুক্ত হন। এই সময় তড়িৎপ্রবাহ নিয়ে নানা পরীক্ষাগারে বিবিধ পরীক্ষা চলছিল। দেখা গেল বায়ু ভেদ করে যখন তড়িৎ-প্রবাহ যায় তখন অনেক বিস্ময়কর ও চমৎকার চমৎকার ব্যাপার ঘটে। সাধারণ অবস্থায় বায়ু তড়িৎপ্রবাহে প্রচণ্ড বাধা দেয়, কিন্তু একটা কাচের বদ্ধ পাত্র থেকে ধীরে ধীরে যদি বায়ু নিষ্কাশিত করা যায় তবে পাত্রটা নানা বর্ণের আলোতে রঞ্জিত হতে থাকে। ক্রুক্‌স্ এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার পর বহু বিজ্ঞানী তাঁদের পরীক্ষাগারে নানা পরীক্ষা করতে থাকেন। এই রকমের এক

পরীক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন রন্‌টশেন। তিনি কাচের বাল্‌ব নিজেই তৈরি করেছিলেন, আর তা যথাসম্ভব বায়ুমুক্ত করে তার ভিতরে তড়িৎ মোক্ষণ পাঠাচ্ছিলেন। যে ডেস্কের উপর পরীক্ষা হচ্ছিল তাতে স্তূপাকার বই, কাচের নল, ফটোগ্রাফির প্লেট প্রভৃতি ছিল। সেদিন কাগজে মোড়া একটি ফটোগ্রাফির প্লেটের উপর একখানা বই ছিল, আর কতদূর পড়া হয়েছে তার চিহ্নস্বরূপ বই-এর মধ্যে একটা চাবি ছিল। এর দু'একদিন পরে বাইরের একটা দৃশ্যের আলোকচিত্র নিতে তিনি ওই প্লেট ব্যবহার করলেন। প্লেটটা ডেভেলাপ করে দেখলেন তাতে একটা চাবির ছায়া পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তিনি তাঁর ছাত্রদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের কেউ ওই প্লেট নিয়ে নাড়াচাড়া করেছে কিনা। সকলেই 'না'বলল। তখন তিনি এই ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করলেন। তিনি ডেস্কের উপর আগের জিনিসগুলি সাজালেন, যে ভাবে সেগুলি সাজান ছিল ঠিক সেই রকমে। বালবের মধ্যে তড়িৎ মোক্ষণ পাঠালেন, প্লেটটা ডেভেলাপ করলেন, চাবির ছবি ঠিক আগের মতোই দেখা গেল।

এখন রন্‌টশেন নানা রকমের জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন, লক্ষ্য করলেন যে, ওই বিস্ময়কর অদৃশ্য রশ্মি বই-এর পাতা ছাড়া আরও বহু জিনিস ভেদ করে যেতে পারে। কয়েক মাস ধরে পরীক্ষা চলল, কিন্তু তিনি ঐ অদৃশ্য রশ্মিকে দৃষ্টিগোচর করবার কোন উপায় খুঁজে পেলেন না। হঠাৎ তাঁর মাথায় এল যে ওই পাত্রের কাচ যখন তড়িৎ মোক্ষণে দীপ্তি দেয়তখন ওই অদৃশ্য আলোক পাতে অন্য জিনিসও ভাস্বর হতে পারে। একে একে পঞ্চাশ রকমের জিনিস নিয়ে তিনি পরীক্ষা করে গেলেন। শেষে লক্ষ্য করলেন যে এই অদৃশ্য আলো যখন বেরিয়ম প্লাটিনোসায়ানাইডের উপর পড়ে তখন ওই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল হয়, তিনি এখন একটা কার্ডবোর্ডের একদিকে একখানা কালো কাগজ অঁাটলেন, আর অন্য

দিকটায় বেরিয়ম প্লাটিনোসায়ানাইড মাখালেন। দেখা গেল অদৃশ্য আলো পড়লে এই দিকটা বেশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

অঙ্কশাস্ত্রে যেটা অজ্ঞাত থাকে তাকে একৃস্ বলা হয়। রন্টশেন এই নতুন পাওয়া অজ্ঞাত অপরিচিতের নাম দিলেন একৃস্-রশ্মি। এই রশ্মি আলোর সাধারণ নিয়ম তুচ্ছ করে অস্বচ্ছ কালো কাগজ ভেদ করে বেরিয়ে এল। ১৮৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে রন্টশেন বৈজ্ঞানিক জগতে তাঁর নতুন আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন। বিদ্যুৎবেগে এই সংবাদ পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ল।

এখন রন্টশেন ভাবতে লাগলেন, ওই রশ্মি যখন কালো কাগজ ভেদ করল তখন আর কি কি অস্বচ্ছ জিনিসের মধ্য দিয়া যেতে পারে ? অনুসন্ধান আরম্ভ হল। বেরিয়ম প্লাটিনোসায়ানাইড পর্দা আর ওই নলের মধ্যে রন্টশেন হাজার পৃষ্ঠার একখানা বই এবং পর পর দু' প্যাকেট তাস ধরলেন, রশ্মি সে সব ভেদ করে পর্দাকে উদ্দীপ্ত করল। কিন্তু তামা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়ামের পাত ভেদ করে যেতে পারল না। ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের নানা পর্দা ধরে রন্টশেন লক্ষ্য করলেন যে, যার ঘনত্ব বেশি তার ভিতর দিয়ে রশ্মি সে রকম যেতে পারে না, কম ঘনত্বের জিনিসই ভেদ করে যায়। রন্টশেন নিজের হাত রাখলেন, দেখলেন, যেখানে হাড় রয়েছে রশ্মি সেই হাড় ভেদ করে যেতে পারল না, কিন্তু মাংস ভেদ করে অনেক পরিমাণে গেল। কাজে কাজেই পর্দার উপর হাতের ভিতরকার হাড়ের ছবি স্পষ্ট দেখা গেল। জার্মানীতে যেদিন রন্টশেন একৃস্-রশ্মি আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন তার তিন দিন পরে মানুষের দেহের ভিতরকার হাড়ের ছবি লণ্ডনের বিজ্ঞানীদের স্তম্ভিত করল। এক আকস্মিক ঘটনা থেকে রন্টশেন পদার্থবিদ্যার ও চিকিৎসাবিদ্যার নতুন নতুন প্রবেশ পথ খুলে দিলেন ; যা দৃষ্টির অগোচর ছিল মানুষ তা দেখল।

কিন্তু কি এ অদৃশ্য রশ্মি, এর প্রকৃতি কি ? আলো হতে পারে না, কারণ এ যে অস্বচ্ছ পদার্থ ভেদ করে চলেছে। ওই-জাতীয়

আর কিছু কি? একথার মীমাংসা আরো পরে হল। প্রমাণিত হল যে, আলো যেমন ইথার-তরঙ্গ এক্স্-রশ্মিও তাই, তবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই ছোট, আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের প্রায় দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। মানুষ নানারকমের এক্স্-রশ্মিকে কাজে লাগাল। লোহার ভিতরে কোন দোষ আছে কিনা এক্স্-রশ্মি ধরে দিল, আবার হীরা জহরৎ খাঁটি কিনা এক্স্-রশ্মি তা বলে দিল। দেহের মধ্যে কোথায় হাড় ভেঙে গেছে এক্স্-রশ্মি তাদেখিয়ে দিল; আবার ডাক্তার দেখে নিলেন, সরে যাওয়া হাড় ঠিক মত বসিয়েছেন কিনা। শিশু খেলা করতে করতে সিকিটা গিলে ফেলেছে। এক্স্-রশ্মি তা দেখিয়ে দিল। মানুষের হৃদ্‌যন্ত্রের আকার অবস্থিতি এক্স্-রশ্মি চোখের সামনে ধরল। ফুসফুস যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত কিনা, কিডনীতে পাথর আছে কিনা, এক্স্-রশ্মি-ফটোগ্রাফ তার সাক্ষ্য দিল। এক্স্-রশ্মি দিয়ে বায়োস্কোপের ফিল্ম তুলে মানুষের ফুসফুস কি রকম কাজ করছে দেখা গেল। বেরিয়ম সালফেট এক্স্‌রশ্মির পক্ষে অস্বচ্ছ। একজনকে বেরিয়ম সালফেট খাওয়ানো হল, ওটা যখন অন্ত্রের মধ্যে ঢুকল তখন এক্স্-রশ্মি ফটোগ্রাফ নেওয়া হল, অন্ত্রের ছায়া পড়ল, অন্ত্রের পথ স্বাভাবিক আছে কিনা জানা গেল। বেশী ভোল্টে চালিত বালব থেকে যে এক্স্-রশ্মি বেরল তা দেহের ভিতরকার ক্যানসার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রদ হল। সম্প্রতি কলিকাতার চিত্তরঞ্জন ক্যানসার ইনষ্টিটিউটে দশলক্ষ ভোল্টে চালিত একটি এক্স্-রশ্মির সরঞ্জাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চিকিৎসা জগতে এক্স্-রশ্মি যুগান্তর আনল।

এক্স্-রশ্মির আবিষ্কার হল হঠাৎ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাসে এরকম বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু হঠাৎ হলেও প্রকৃতি তার দরজা একটু একটু করে খুলে দেন শুধু তাঁকেই যিনি ওই দরজায় অনবরত ঘা দিতে থাকেন।

১৯০০ সালে রন্টশেন তার আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার

পেলেন। তিনি দীর্ঘকাল ম্যুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। এক্স-রশ্মি কি? এর অন্য কোন নাম থাকলে বল। কে, কিভাবে এই রশ্মি আবিষ্কার করেন? [৩+১+৬]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

২। রঞ্জন রশ্মি কিভাবে মানুষের উপকার করে? [৩]

৩। এক্স-রশ্মির সাহায্যে কিভাবে ফটো তোলা যায়? [৩]

৪। রন্টেশন তাঁর আবিষ্কারের জন্য কি সম্মান লাভ করেছিলেন? [৩]

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৫। বাক্য রচনা কর: পদার্থবিদ্যা, অনবরত, দুরারোগ্য, তড়িৎ প্রবাহ।

৬। টীকা লিখ:—

ক্রুক্স, ইথার তরঙ্গ, হৃদ্‌যন্ত্র, ভোল্ট, নোবেল পুরস্কার।

৭। সমাসের নাম বল ও ব্যাসবাক্য লিখ:—

জন্মগ্রহণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বায়ুমুক্ত, যথাসম্ভব, হৃদ্‌যন্ত্র, আকার-অবস্থিতি।

পরাজিত এভারেস্ট

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় জীবিতকালে আকাশবাণীর 'গল্পদাদুর আসরের 'গল্পদাদু' রূপে বাঙলাদেশের সকলেরই প্রিয় ছিলেন। গল্পরচনায়, অনুবাদে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। প্রাঞ্জল ভাষায় শিশুর কৌতূহল আকর্ষণ ছিল তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য। এঁর মৃত্যুতে বাঙলার কিশোরেরা তাদের অতি প্রিয়জনকে হারিয়েছে।

ইনি সম্ভবতঃ ১৩১২ বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৭০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ দেহত্যাগ করেন।]

ভারবাহী শেরপাদের বাদ দিয়ে হিমালয়ের এই শেষ অভিযানে কর্নেল হাণ্টের নায়কত্বে তের জন নির্বাচিত পর্বত-আরোহী ছিলেন। এই তের জনের মধ্যে একজন হলেন ভারতীয় তেনজিং, আর দুজন হলেন নিউজিল্যাণ্ডবাসী, বাকী সকলেই ইংরেজ।

এভারেস্ট অভিযানের যাত্রাকেন্দ্র হল—নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু। এইখানেই নানা দিক থেকে অভিযাত্রীরা সকলে এসে মিলিত হলেন এবং এখান থেকেই কুলীদের সংগ্রহ করা হয়। আগেকার অধিকাংশ অভিযানের মত এই অভিযানও 'আলপাইন ক্লাব' আর ইংলণ্ডের জগদ্বিখ্যাত 'রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি'র যুক্ত তত্ত্বাবধানে গঠিত হয়।

ইতিমধ্যেই তেনজিং-এর কাছে আমন্ত্রণ-পত্র পৌঁছে গিয়েছিল। তেনজিংকে বাদ দিয়ে কোন এভারেস্ট অভিযানই গঠিত হতে পারে না। কিন্তু সুইস-অভিযান থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তেনজিং অতি কঠিন ম্যালেরিয়া রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তাঁর শরীর

রীতিমত দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু এভারেস্টের আমন্ত্রণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেহ মন থেকে সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেললেন। ঘরে শান্ত, স্নিগ্ধ, মমতাময় জীবনকে পিছনে ফেলে রেখে, তিনি ছুটলেন মৃত্যুসঙ্কুল সেই ভয়ঙ্করের পথে।

ভয়ঙ্কর যাদের ডাকে, কোন বন্ধনই আর তাদের ধরে রাখতে পারে না। তিনি কাঠমাণ্ডুতে এসে অভিযাত্রীদের সঙ্গে যোগদান করলেন এবং প্রথমেই কর্নেল হাণ্টকে জানালেন, তিনি এই অভিযানে যোগদান করার জন্যেই এসেছেন, কিন্তু তাঁর একটা শর্ত আছে, সে শর্ত মেনে না নিলে তিনি এই অভিযানে যোগদান করবেন না। সে শর্ত হল, তাঁকে পুরোপুরি অভিযাত্রী বলে মেনে নিতে হবে এবং যদি তিনি সক্ষম হন, তাহলে তাঁকে একাই এভারেস্টের চূড়ার দিকে অগ্রসর হবার অধিকার দিতে হবে।

কাঠমাণ্ডুর ব্রিটিশ এম্‌বেসীতে এই নিয়ে সভা বসল এবং সভায় স্থির হল, তেনজিং-এর শর্ত স্বীকার করা হবে। তেনজিং আনন্দে অভিযানের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। চারিদিক থেকে কুলীরা আসতে লাগল। তেনজিং তার 'ভেতর থেকে লোক বাছাই করতে লাগলেন।

সমস্ত আয়োজন শেষ হয়ে গেল, দুই দলে অভিযানকে ভাগ করা হল। প্রথম দলে রইলেন ন'জন অভিযাত্রী, আর রইল একশো বাষট্টি জন ভারবাহী আর আঠারো জন শেরপা। দ্বিতীয় দলে রইলেন স্বয়ং কর্নেল হাণ্ট আর তিনজন অভিযাত্রী, সঙ্গে থাকলো দু'শো জন ভারবাহী আর দু'জন শেরপা। সমস্ত মালের ওজন হল সতের শ' পাউণ্ড।

কাঠমাণ্ডু থেকে অভিযান যাত্রা করল নামচে-বাজারের দিকে— কাঠমাণ্ডু থেকে এক শ' সত্তর মাইল দূর। এই নামচে-বাজার থেকে প্রকৃতপক্ষে সুরু হল আসল অভিযান।

থায়াংবক থেকে শুরু হয়েছে এভারেস্টের তুষারক্ষেত্র। একটা

বিরাট গ্লেশিয়ারের প্রান্তেই থায়াংবক। এইখানেই সমস্ত অভিযান তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করে রইল, কারণ, এইখানে হিমালয়ের তুহিন-প্রকৃতির সঙ্গে অভিযাত্রী আর শেরপাদের নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলতে হয়। তাছাড়া, এইখান থেকেই শুরু হয় পথ-ঘাট জরিপ করে দেখা, নতুন কোন ভাল পথ খুঁজে পাওয়া যায় কিনা, সামনের পথের অবস্থা কি রকম, পরবর্তী তাঁবু কোন জায়গায় স্থাপন করা সম্ভব হবে—সব এইখান থেকেই নির্ধারিত হয়।

থায়াংবক মঠের সামনে থেকেই সুরু হয়েছে বিশাল খুম্বু গ্লেশিয়ার বা হিমবাহ। এই হিমবাহ পেরিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

এইখান থেকেই বাতাস খুব পাতলা হয়ে আসে। তাই এখানে কয়েকদিন বাস করে এই পাতলা বাতাসকে সহ্য করে নিতে হয়।

তেনজিং আর হিলারী সাত নম্বর তাঁবু থেকে যাত্রা করলেন। তাঁরা ঠিক করলেন, সোজা এভারেষ্টের চূড়ার দিকে অগ্রসর না হয়ে, তাঁরা যত উঁচুতে পারেন গিয়ে এমনভাবে আট নম্বর তাঁবু ফেলবেন যাতে রাত্রির বিশ্রামের শেষে পরের দিন সকালবেলায় তাঁরা শেষ তিনশ' কি সাড়ে তিনশ' ফুট জয় করে ফিরে আসতে পারেন। এই উচ্চতায় তাঁদের সঙ্গে আর একজন তরুণ শেরপাও এসেছিল—তার নাম আংগনিমা। তাঁদের দু'জনকে সাহায্য করবার জন্য গ্রেগ্‌রী লাওয়ি আর আংগনিমাকে পাঠানো হয়।

সাত নম্বর তাঁবু থেকে পথ প্রায় খাড়া সোজা উপরের দিকে উঠে গিয়েছে, প্রত্যেক পদে নিজের হাতে বরফ কেটে ধাপ তৈরী করে সেই খাড়া পথে উঠতে তাদের দু'জনেরই মেরুদণ্ড যেন ভেঙে পড়তে লাগল। তার ওপর তাঁরা ভীত হয়ে দেখলেন, তাঁদের অক্সিজেন-যন্ত্রের অক্সিজেন প্রয়োজনীয় মাত্রা থেকে অনেক কমে গিয়েছে। তখন বাধ্য হয়ে তাঁরা কম মাত্রায় অক্সিজেন নিতে লাগলেন।

কিন্তু সেই খাড়া পাহাড়ের গায়ে কোথাও একটু তাঁবু ফেলার মতন সামান্য জায়গাও পাওয়া গেল না। বহু খোঁজাখুঁজির পর

সাতাশ হাজার আটশো ফুট উঁচুতে আট নম্বর তাঁবু ফেলা হল।

ভোর ছ'টা বাজতেই তেনজিং আর হিলারী শেষ অভিযানের জন্য সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ন'টার সময়ে তাঁরা দক্ষিণ চূড়ায় এসে উঠলেন, সেখান থেকে এভারেষ্টের মূল চূড়া হল আর আধ মাইল মাত্র। সেখানে এসে মিনিট দশেক তাঁরা একটু বিশ্রাম করে নিলেন। মুখ থেকে অক্সিজেন নেবার মুখোশটা খুলে ফেললেন, দেখলেন বিশেষ কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

অক্সিজেন-যন্ত্রের দিকে চেয়ে তারা ভীত হয়ে উঠলেন। যেটুকু অক্সিজেন আছে, তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। স্বাভাবিক মাত্রায় যদি নেওয়া হয় তাহলে চূড়ায় পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই ফুরিয়ে যাবে; তখন হিসেব করে তাঁরা অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দিলেন। তাতে অবশ্য নিঃশ্বাস নিতে একটু অসুবিধা হতে লাগল। কিন্তু দুর্জয় পণ যাঁদের মনে, তাঁরা সব অসুবিধার উপর দাঁড়াতে পারেন।

সেখান থেকে আধ মাইল পথ অতিক্রম করতে আড়াই ঘণ্টা লাগল। সাড়ে এগারটার সময় তেনজিং এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে উঠলেন, তারপর হিলারীকে হাত বাড়িয়ে উপরে তুলে নিলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে মানুষের অবিরাম অবিশ্রান্ত সাধনা সেদিন জয়যুক্ত হল।

চূড়ায় পদার্পণ করে তেনজিং নতজানু হয়ে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করলেন—সঙ্গে যে চকোলেট আর বিস্কুট ছিল তারই অর্ঘ্য মাটিতে রেখে ইষ্ট দেবতাকে নিবেদন করলেন।

তারপর নেপাল আর ভারতের পতাকা সেখানে পুঁতলেন। ভারতের পতাকা তাঁকে কোন ভারতীয় নেতা বা ভারত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি দেননি তাঁর এক বাঙালী বন্ধু একটি ছোট ত্রিবর্ণ পতাকা তাঁর হাতে দেন। বন্ধুর সেই ছোট্ট পতাকাটুকু রাখল ভারত রাষ্ট্রের সম্মান।

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। তোমার পঠিত নিবন্ধানুসারে এভারেস্ট অভিযানের কাহিনীটি নিজ ভাষায় বিবৃত কর। [১০]

২। তেনজিং অভিযানের ব্যাপারে কাদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ? তাঁর শরীর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিনি কেন সম্মত হ'লেন ? তাঁর শর্ত কী ছিল ? তা তারা কী ভাবে মঞ্জুর করেছিলেন ? [৩+২+২+৩]

৩। এভারেস্ট অভিযানের আয়োজন সম্বন্ধে লিখ। তেনজিং ও হিলারীর যুগ্ম অভিযানের পরিচয় প্রদান কর। [৫+৫]

৪। থায়াংবক সম্বন্ধে কী জানো ? এখান থেকে শুরু করে অভিযানের শেষ পর্যায় পর্যন্ত কাহিনীর বর্ণনা দাও। [৪+৬]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৫। **টীকা লেখ :** এভারেস্ট, কাঠমাণ্ডু ব্রিটিশ এম্বেসী, গ্লেশিয়ার, অক্সিজেন, ভগবান বুদ্ধ।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৭। শব্দার্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর :
আরোহী, ভারবাহী, তুহিন, দুর্জয়।

অদৃশ্য বিচারক / বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[শরৎচন্দ্রের পর বাঙলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক অতুলনীয় গল্পশিল্পী। বাঙলাদেশের পল্লীপ্রকৃতির মতই তিনি মরমী, জীবন্ত এবং ধ্যানস্থ।

তাঁর জন্ম ২৪ পরগণার বনগ্রাম মহকুমার বারাকপুর গ্রামে। তিনি ১৮৯৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন. ১৯৫০ সালের ১লা নভেম্বর মারা যান। পথের পাঁচালী তাঁর বিখ্যাত রচনা। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়।

এই অংশ বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী উপন্যাসের 'বল্লালী-বালাই 'নামক অংশের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে সংকলন করা হয়েছে।]

বৃটিশ-শাসন তখনও দেশে বদ্ধমূল হয় নাই। যাতায়াতের পথগুলি ঘোর বিপৎসঙ্কুল ও ঠগী, ঠ্যাঙাড়ে, জলদস্যু প্রভৃতি পূর্ণ থাকিত। এই ডাকাতের দল প্রায়ই গোয়ালা, বাগ্‌দী, বাউরী শ্রেণীর লোক। তাহারা অত্যন্ত বলবান,—লাঠি এবং সড়কি চালনাতে নিপুণ ছিল। বহু গ্রামের নিভৃত প্রান্তে ইহাদের স্থাপিত ডাকাতে-কালীর মন্দিরের চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। দিনমানে ইহারা ভালমানুষ সাজিয়া বেড়াইত, রাত্রে কালীপূজা করিয়া দূরপল্লীতে

গৃহস্থবাড়ী লুঠ করিতে বাহির হইত। তখনকার কালে কোন কোন সমৃদ্ধ গৃহস্থও ডাকাতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিত।

বিষ্ণুরাম রায়ের পুত্র বীরু রায়ের এরূপ অখ্যাতি ছিল। তাহার অধীনে বেতনভোগী ঠ্যাঙাড়ে থাকিত। নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের উত্তরে যে কাঁচা সড়ক ওদিকে চুয়াডাঙ্গা হইতে আসিয়া নবাবগঞ্জ হইয়া টাকী চলিয়া গিয়াছে, ওই সড়কের ধারে দিগন্তবিস্তৃত বিশাল সোনাডাঙ্গার মাঠের মধ্যে ঠাকুরঝি-পুকুর নামক এক বড় পুকুরের ধারে ছিল ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডা। পুকুরধারে প্রকাণ্ড বটগাছের তলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত এবং নিরীহ পথিককে মারিয়া তাহারা যথাসর্বস্ব অপহরণ করিত।

গ্রামের উত্তরে এই বিশাল মাঠের মধ্যে এই বটগাছ আজও আছে এবং সড়কের ধারের একটা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিকে আজও ঠাকুরঝি-পুকুর বলে। পুকুরের বিশেষ চিহ্ন নাই, চৌদ্দ আনা ভরাট হইয়া গিয়াছে—ধান আবাদ করিবার সময় চাষীদের লাঙ্গলের ফালে এই নাবাল জমিটুকু হইতে আজও মাঝে মাঝে নরমুণ্ড উঠে।

শোনা যায় পূর্বদেশীয় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালক-পুত্রকে সঙ্গে করিয়া কালীগঞ্জ অঞ্চল হইতে টাকী-শ্রীপুরের পথে নিজের দেশে ফিরিতে-ছিলেন। সময়টা কার্তিক মাসের শেষ, কন্যার বিবাহের অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণ বিদেশে বাহির হইয়াছিলেন, সঙ্গে কিছু অর্থ ও জিনিসপত্র ছিল। হরিদাসপুরের বাজারের চটিতে রন্ধন-আহারাদি করিয়া তাঁহারা তুপুরের কিছু পরে পুনরায় পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। ইচ্ছা রহিল যে, সম্মুখে পাঁচ ক্রোশ দূরের নবাগঞ্জের বাজারের চটিতে রাত্রি যাপন করিবেন। পথের বিপদ্ তাঁহাদের অবিদিত ছিল না; কিন্তু আন্দাজ করিতে ভুল হইয়াছিল,—কার্তিক মাসের ছোট দিন, নবাবগঞ্জ পৌছিবার অনেক পূর্বে সোনাডাঙ্গা মাঠের মধ্যেই সূর্যকে ডুবুডুবু দেখিয়া তাঁহারা দ্রুতপদে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেন। ঠাকুরঝি-পুকুরের ধারে আসিতেই তাঁহারা ঠ্যাঙাড়েদের হাতে পড়েন।

দস্যুরা প্রথমে ব্রাহ্মণের মাথায় এক ঘা বসাইয়া দিতেই তিনি প্রাণভয়ে চীৎকার করিতে করিতে পথ ছাড়িয়া মাঠের দিকে ছুটিলেন। ছেলেও বাবার পিছু পিছু ছুটিল। কিন্তু একজন বৃদ্ধ অপরে বালক,—ঠ্যাঙাড়েদের সঙ্গে কতক্ষণ দৌড়-পাল্লা দিবে? অল্পক্ষণেই তাহারা শিকারের নাগাল ধরিয়া ঘেরাও করিয়া ফেলিল। নিরুপায় ব্রাহ্মণ নাকি প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে মারা হয় ক্ষতি নাই, তাঁহার পুত্র বংশের একমাত্র সন্তান, পিণ্ডলোপ ইত্যাদি।

ঘটনাচক্রে বীরু রায়ও নাকি সেদিন দলের মধ্যে উপস্থিত ছিল। ব্রাহ্মণ বলিয়া চিনিতে পারিয়া প্রাণভয়ার্ত বৃদ্ধ তাহার হাতে পায়ে পড়িয়া অন্ততঃ পুত্রটির প্রাণরক্ষার জন্য বহু কাকুতি-মিনতি করেন,—কিন্তু সরল ব্রাহ্মণ বুঝেন নাই, তাঁহার বংশের পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় অপরের মাথাব্যথা হইবার কথা নহে, বরং তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে ঠ্যাঙাড়েদলের অন্যরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হতভাগ্য পিতাপুত্রের মৃতদেহ একসঙ্গে ঠাণ্ডা হেমন্তরাতে ঠাকুরঝি-পুকুরের জলে টোপাপানা ও শ্যামাঘাসের দামের মধ্যে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়া বীরু রায় বাটী চলিয়া আসিল।

এই ঘটনার বেশীদিন পরে নয়, ঠিক পরবৎসর পূজার সময় বাঙলা ১২৩৮ সাল,—বীরু রায় সপরিবারে নৌকাযোগে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী হলুদবেড়ে হইতে ফিরিতেছিলেন। নকীপুরের নীচের বড় নোনা গাঙ পার হইয়া মধুমতীতে পড়িবার পর দুই দিনের জোয়ার পাইয়া তবে আসিয়া শ্রীপুরের কাছে ইছামতীতে পড়িতে হইত। সেখান হইতে আর দিন চারেকের পথ আসিলেই স্বগ্রাম। সারাদিন বাহিয়া আসিয়া অপরাহ্নে টাকীর ঘাটে নৌকা লাগিল। বাড়িতে পূজা হইত। টাকীর বাজার হইতে পূজার দ্রব্যাদি কিনিয়া রাত্রে সেখানে অবস্থান করিবার পর প্রত্যূষে নৌকা ছাড়িয়া দেশের দিকে রওনা হইল। দিন দুই পরে সন্ধ্যার দিকে ধলচিতের বড় খাল ও ইচ্ছামতীর মোহনায় একটা নির্জন চরে জোয়ারের অপেক্ষায় নৌকা

লাগাইয়া রন্ধনের যোগাড় হইতে লাগিল। বড় চর, মাঝে মাঝে কাশঝোপ ছাড়া অন্য গাছপালা নাই।

জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। নোনা গাঙের জল চক্ চক্ করিতেছিল। হঠাৎ কিসের শব্দ শুনিয়া একজন মাঝি রন্ধন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। কাশঝোপের আড়ালে যেন একটা হুটপাট শব্দ, একটা ভয়ার্ত কণ্ঠ একবার অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিয়া তখনই থামিয়া গেল। কৌতূহলী মাঝিরা ব্যাপার কি দেখিবার জন্য কাশঝোপের আড়ালটা পার হইতে না হইতেই কি যেন একটা হুড়ুম করিয়া চর হইতে জলে গিয়া ডুবিল। চরের সেদিকটা জনহীন—কিছুই কাহারও চোখে পড়িল না।

কী ব্যাপার ঘটিয়াছে, কি হইল, বুঝিবার পূর্বেই বাকি দাঁড়-মাঝি সেখানে আসিয়া পৌঁছিল। গোলমাল শুনিয়া বীরু রায় আসিল, তাহার চাকর আসিল। বীরু রায়ের একমাত্র পুত্র নৌকাতে ছিল, সে কই? জানা গেল, রন্ধনের বিলম্ব দেখিয়া সে খানিকক্ষণ আগে জ্যোৎস্নায় চরের উপরে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। দাঁড়ি-মাঝিদের মুখ শুকাইয়া গেল, এ দেশের নোনা গাঙসমূহের অভিজ্ঞতায় তাহারা বুঝিতে পারিল, কাশবনের আড়ালে বালির চরে কুমীর শুইয়া ওৎ পাতিয়াছিল—ডাঙ্গা হইতে বীরু রায়ের পুত্রকে লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর অবশ্য যাহা হয় তাহাই হইল। নৌকার লগি লইয়া এদিকে ওদিকে খোঁজাখুঁজি করা হইল, নৌকা ছাড়িয়া মাঝ নদীতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সকলে সন্ধান করিয়া বেড়াইল,—তাহার পর কান্নাকাটি, হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি। গতবৎসর ঠাকুরঝি-পুকুরের মাঠে, প্রায় এই সময়ে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেন, এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন।

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। 'অদৃশ্য বিচারক,-এর গল্পটি নিজে বর্ণনা কর। [১০]

২। 'ঠ্যাঙাড়ে' বলকে কি বোঝ? এই গল্পের ঠ্যাঙাড়েরা কোথায় থাকত? তাদের কার্যকলাপের বর্ণনা কর। [৪+২+৪]

৩। "গত বৎসর ঠাকুরঝি-পুকুরের মাঠে প্রায় এই সময় যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেন, এক অদৃশ্য বিচারক এ বৎসর ইছামতীর নির্জন চরে তাহার বিচার নিষ্পন্ন করিলেন।" গতবৎসর কি ঘটনা ঘটেছিল? এবছর কিভাবে তাহার বিচার হল? [৫+৫]

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

অর্থ লিখ :

ঠগী, সড়কি, মড়ক. আড্ডা, নাবাল, ভরাট. অস্ফুট, পিণ্ডলোপ।

সন্ধি বিচ্ছেদ কর :—

ভয়ার্ত, নিষ্পন্ন, নিরুপায়, নির্জন।

শেখ হবিবর রহমান

সুন্দরবনে ভ্রমণ

[শেখ হবিবর রহমান সামান্য কয়েকটি লেখা লিখে জনপ্রিয় হয়েছেন। আলোচ্য ভ্রমণ কাহিনী তার লেখনীর মুন্সীয়ানার পরিচয় দেবে।]

আমরা নীলকমলের মোহনায় পৌঁছিলাম।

সুন্দরবনে শিবশা ও পশর নদী যেখানে মিলিত হইয়াছে তাহাকে বলে নীলকমলের মোহনা। এইস্থানে যে কল্পনাতীত দৃশ্য দেখিয়াছিলাম জীবনে তাহা কখনই ভুলিব না। যেদিকে তাকাও শুধু জল আর জল। জল ও আকাশ ছাড়া অন্য কিছুই দেখা যাইতেছিল না; পশ্চিম দিকে বহু দূরে বনের সামান্য কৃষ্ণরেখা। এই অনন্ত জলরাশি; ইহার মধ্যে কত জীবনমরণের রহস্য লুক্কায়িত আছে কে জানে? পয়ঃপ্রকৃতির কত গুহ্য লীলাই এখানে না চলিতেছে! কেহ তাহা দেখে না, কেহই তাহা জানে না। চারিদিক স্তব্ধ অতিবৃদ্ধ বিশাল বৃক্ষরাশি মহাকালের নীরব সাক্ষীর মতো গম্ভীরভাবে কোন্ আদিম যুগ হইতে এই সলিলের খেলা দেখিতেছে। মনে মনে ভাবিলাম, চৈত্র-বৈশাখ মাসে যখন ঝঞ্ঝাবাত প্রবলবেগে বহিতে থাকে, তখন এখানে কি প্রলয়ের খেলাই না আরম্ভ হইয়া যায়! পবন আর বরুণের সে মহাযুদ্ধ কোন্ মানব দেখিতে আসিতেই বা সাহসী হইতে পারে। অসংখ্য দৈত্য-দানবের

লীলাভূমি এই সুন্দরবন। সেই প্রলয় তাণ্ডব তাহাদের উপভোগের জন্য—ক্ষীণপ্রাণ মানবের জন্য নয়।

প্রায় এক ঘণ্টায় চোমোহনা পাড়ি দিয়া আমরা পশরে আসিয়া পড়িলাম। ক্রমে 'আগুনজল' নামক স্থানে আমরা বেলা প্রায় চারিটার সময় আসিয়া নঙ্গর করিলাম। ক্ষুদ্রবৃহৎ শতাধিক হরিণ বৃক্ষতলে তৃণাস্তৃত ভূমিতে স্বচ্ছন্দে নিশ্চিন্ত হইয়া চরিয়া বেড়াইতেছে। সুন্দরবনে ভীষণ ব্যাঘ্রের পাশাপাশি এত নিশ্চিন্তভাবে অন্য কোনও জীবই চরিয়া বেড়াইতে পারে না। ব্যাঘ্র অপেক্ষা দ্রুততর গতি ও অধিকতর সতর্কতা এই দুই প্রকৃতিদত্ত শক্তিই হরিণদের প্রধান সম্বল। স্থানে স্থানে দুই চারিটি বানরকেও ইহাদের সহিত ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিলাম। ইহারা যেন রাখাল হইয়া হরিণদের চরাইতেছে। দেখিলাম, কেহ কেহ তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঘোড়দৌড় খেলিতেছে। দু'চারিটি শৃঙ্গধারী কুরঙ্গরাজ মাথা উঁচু করিয়া আমাদের দিকে আয়তলোচনে চাহিয়া রহিল—তাহাদের দৃষ্টিতে নীরব প্রশ্ন—"তোমরা কি চাও?" মানুষকে তাহারা ভয় করিতে শিখে নাই। কেহই ভয়ে পলাইল না।

বঙ্গোপসাগর-কূলে দুর্বার চটি আমাদের শেষ লক্ষ্যস্থল। রাত্রিতে আমাদের নৌকা ছাড়া হইল।

বেলা প্রায় দশটার সময়ে সমুদ্র আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সম্মুখে দিগন্ত প্রসারিত বিশাল বঙ্গোপসাগর ধূ ধূ করিতেছে। সাগরের মধ্যে দু'চারখানি নৌকা বহুদূরে যেন মোচার খোলার মত ভাসিতেছিল; শুনিলাম, মগেরা এই স্থানে মাছ ধরিবার আড্ডা গাড়িয়াছে; এই আড্ডায় তিন চার হাজার মগ বাস করে।

অতঃপর আমরা ক্ষুদ্র একটি খাল বাহিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিলাম স্থানে স্থানে মাটির ভিতর ইটের স্তূপ পরিদৃষ্ট হইল। কবে কাহারা এই সুদূর দক্ষিণদেশে সমুদ্রের ধারে বাস করিত, তাহাদের কথা আজ কেহই জানে না। সুন্দরবনের স্থানে স্থানে এইরূপ মানববসতির বহু

নিদর্শন পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, এই সমস্ত অঞ্চলে দস্যু-তস্করেরা অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তার সহিত বাস করিত। সেইগুলি তাহাদের বসতির চিহ্ন। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন বহুপূর্বে সুন্দরবনে বহু পুর-জনপদ ছিল। কালক্রমে মাটি নিম্ন হইয়া যাওয়ায় সেগুলি ধ্বংস পাইয়াছে।

সম্মুখে কৃষ্ণাচতুর্দশীর ঘোর অন্ধকারময়ী রজনী। ভাটায় জল কমিয়া যাওয়ায় সন্ধ্যা পর্যন্ত নৌকা-চলাচলের উপায় নাই। আমাদের নৌকায় বন্দুক নাই; চতুর্দিকে বেশ শক্ত কাঠের বেড়া আছে বটে। যে ডিঙি পানীয় জলের জন্য আগে চলিয়া গিয়াছিল বন্দুক সে ডিঙিতে ছিল।

সুন্দরবনের এই অংশের এই সমুদ্রোপকূলের ব্যাঘ্র যেমন হিংস্র তেমনি নির্ভীক। তাহারা বন্দুকধারী মানুষকেও বড় একটা গ্রাহ্য করে না। অন্যস্থানের বাঘ তাড়াহুড়া করিলে সরিয়া যায়, কিন্তু ইহারা নাকি আগাইতে জানে পিছাইতে জানে না। লোকে বলে, ক্রমাগত সমুদ্রগর্জনে শ্রবণশক্তি লোপ পাইয়াছে। তাই তাড়ার কোন শব্দ ইহাদের কর্ণগোচর হয় না।

আমরা ক্রমাগত 'কু' দিয়া ডিঙির সন্ধান লইতে লাগিলাম কিন্তু 'কু'র কোনই উত্তর পাওয়া গেল না। সুন্দরবনে দূর হইতে চীৎকার করিয়া ডাকাডাকি করিবার নিয়ম নাই, কারণ, মনুষ্যকণ্ঠ শ্রবণে ব্যাঘ্র মনুষ্যের সন্ধান পাইয়া শিকারে অগ্রসর হইতে পারে। অন্ধকারের কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে; কিন্তু উপায় নাই।

ক্ষুধাতৃষ্ণায় তখন সকলেরই দেহমনএকান্ত অবসন্ন। বিষম উদ্বেগে আমরা সকলেই অস্থির। এখন খালে ধীরে ধীরে জোয়ারের জল প্রবেশ করিতেছিল, প্রায় ৪৫ মিনিটের মধ্যে আমাদের নৌকা ভাসিয়া উঠিল। আরও কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। এক স্থানে আমাদের নৌকা আবদ্ধ হইল। উপরে বৃক্ষের প্রকাণ্ড শাখা, নীচে কর্তিত-বৃক্ষ জলে পড়িয়া পথ অবরোধ করিয়া আছে।

আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এইস্থানে আসিয়া থামিতে হইল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, বনভূমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সঙ্কীর্ণ খাল, খালের উপর হইতে আমাদের নৌকায় আসিতে ব্যাঘ্র মহারাজের একটুও অসুবিধা হইবার কথা নহে।

জোয়ারের জল বৃদ্ধি পাওয়ায় কিঞ্চিৎ বিলম্বে আমরা মুক্তি পাইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দেখিলাম, সম্মুখে মুক্ত প্রান্তর ; বেশ আলো। এখন আমাদের ডিঙি নয়নপথে পতিত হইল। নৌকাচালক দুইজন অরক্ষিত নৌকায় থাকা নিরাপদ মনে না করিয়া এতক্ষণ গাছের উপর উঠিয়া বসিয়াছিল। আমাদিগকে দেখিয়া তাহারা নামিয়া আসিল।

আমরা দুর্বার চটিতে আসিয়া পেঁাছিলাম। রাত্রিতে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া এইস্থানেই কাটাইতে হইবে। এইরূপ ভয়ঙ্কর স্থান নাকি সমগ্র সুন্দরবনে আর নাই। উত্তর-পূর্বদিকে ভীষণ বন, নিরতিশয় নিবিড়। পশ্চিম-দক্ষিণকোণে বিস্তীর্ণ মাঠ। মাঠের মধ্যে মধ্যে কাশবন। স্থানে স্থানে ঢিবি, স্থানে স্থানে গর্ত। এই সমস্ত কাশবনে ও গর্তেই ব্যাঘ্রের থাকিবার স্থান। ইহারা শৌখিন বাবুদের মত অবসর সময়ে এই মাঠে আসিয়া হাওয়া খায়, খেলা করে।

আজ আর কেহই ডিঙ্গিতে শুইতে সাহসী হইল না। আমরা দশটি প্রাণী এই পানসীর মধ্যে দরজা জানালা অর্গলাবদ্ধ করিয়া শঙ্কার সহিত রাত্রি কাটাইলাম। বাহিরে নৌকার ছাদে বেশ জোরের সহিত হ্যারিকেন জ্বলিতে লাগিল। সকলের বিশ্বাস যে, আলোর নিকটে বাঘ আসিতে ভয় পায়।

রজনী-প্রভাতে সকলে গাত্রোত্থান করিলাম। হিসাব করিয়া দেখা গেল আমরা সকলেই খোশমেজাজে বহাল তবিয়তে বাঁচিয়া আছি।

[সংক্ষেপিত]

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। 'নীলকমলের মোহনা' কাকে বলে ? লেখক এই মোহনায় কি কি দৃশ্য দেখলেন ? এই দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁর কি মনে হতে থাকল ? [২+৩+৫]

২। চৌমোহনা থেকে দুর্বার চটি পর্যন্ত যাত্রাপথের বর্ণনা দাও। [১০]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৩। "সুন্দরবনে বাঘের ভয় যাত্রাপথকে উপভোগ করতে দেয় না"— সুন্দরবনে ভ্রমণ গল্প পড়ে এ কথা সত্য বোধ হয় কি ? কেন ? [২+২]

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৪। অর্থ বল :—মোহনা, পয়ঃপ্রকৃতি, গুহ্য, তবিয়েত।

৫। সমাসের নাম ও ব্যাসবাক্য লেখ :—তৃণাস্তৃত, কুরঙ্গরাজ, অর্গলাবদ্ধ।
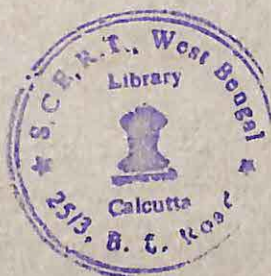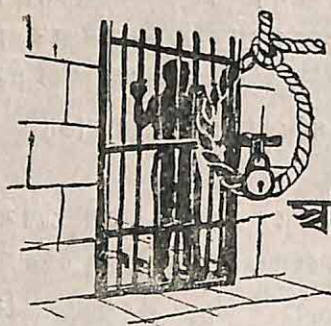
স্বাধীনতার স্বপ্ন

নীরদ হাজরা

[নীরদ হাজরা একজন তরুণ লেখক। তিনি প্রধানতঃ শিশু ও কিশোরদের জন্য লেখেন। তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থ কিশোরদের মন জয় করেছে। বিতর্ক ইত্যাদি নানা বিষয় শিক্ষার জন্য তাঁর লেখা 'বাচনিক রীতি ও পদ্ধতি' বাঙলা ভাষায় এক আকর গ্রন্থ। 'আবৃত্তি কোষ' তাঁর অন্য এক অবদান।

১৯৩৪ সালে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় রাজবাড়িতে তাঁর জন্ম হয়।]

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, "রক্ত দাও, আমি স্বাধীনতা দেব।"

নেতাজীর এই আহ্বানের মধ্যে এক নিগূঢ় সত্য রয়েছে। বহু মানুষের রক্তদানের ভিতর দিয়েই আসে স্বাধীনতা। শহীদ প্রাণের আত্মদানের লাল রঙে রাঙা হয়ে উদিত হয় স্বাধীনতার সূর্য। আমাদের এই স্বাধীনতার জন্যও শতশত শহীদ আপন প্রাণের তাগিদে আত্মদান করে আমাদের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করে গেছেন। এখানে আমরা তেমন কয়েকজন শহীদের কথা আলোচনা করব।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতবর্ষের তিনটি প্রদেশ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হয়ে ওঠে। সে তিনটি প্রদেশ হ'ল বাঙলা, পাঞ্জাব আর মহারাষ্ট্র। আমাদের এ কাহিনী মহারাষ্ট্রের।

মহারাষ্ট্রের এক অখ্যাত পল্লীতে জন্মেছিলেন এক সামান্য মানুষ।

নাম তার বাসুদেব ফড়কে। বাঙলাদেশের বাঘা যতীনের মত তিনিও ইংরেজ-অফিসের কেরাণী ছিলেন। কিন্তু এই সামান্য মানুষটিই সমগ্র মহারাষ্ট্রের প্রাণে প্রাণে তীব্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেন।

সেই যুগে দাঁড়িয়ে ফড়কে স্বাধীন ভারত এবং জাতীয় সরকারের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এজন্য তিনি কোন বিদেশী সরকারের সাহায্য নিতে যান নি। তিনি সমগ্র মহারাষ্ট্রে ঘুরে ঘুরে যুবকদের নিয়ে ব্যায়ামের আখড়া খুলতে লাগলেন। গোপনে দিতে থাকলেন অস্ত্র শিক্ষা। শিবাজীর আদর্শে পার্বত্য উপজাতিদের নিয়ে গড়ে তুললেন সেনাবাহিনী। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষসংগ্রাম শুরু হয়ে গেল।

ইংরেজ সরকার ফড়কের মাথার দাম স্থির করলেন চার হাজার টাকা। ইস্তাহারের তলায় সই ছিল বোম্বাই-এর গভর্নর স্যার রিচার্ড ইম্পেলের। ফড়কে পাল্টা ইস্তাহারে ঘোষণা করলেন, স্যার রিচার্ড ইম্পেলের মাথা যে আনতে পারবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে সাত হাজার টাকা।

ভারতবর্ষে বিশ্বাসঘাতক কম নেই। এমন কয়েক জনের চেষ্টায় ফড়কে মহীশূরের এক মন্দিরে ধরা পড়ে গেলেন। আতঙ্কিত ইংরাজরা তাঁকে এদেশে রাখতে সাহস পেল না। নিয়ে গেল এডেনে। এডেনের কারাগার থেকেও পালালেন ফড়কে। আবার ধরা পড়লেন। শেষ পর্যন্ত এডেনেই তাঁর মৃত্যু হ'ল।

ফড়কে মরেও অমর হয়ে রইলেন তাঁর আখড়ার শিষ্যদের মনে। তাঁর অসংখ্য শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিলেন বাল গঙ্গাধর তিলক। তিনি ফড়কের ব্যর্থতার কারণ বুঝে গোড়া বেঁধে কাজে নামলেন। তিনি চাইলেন আগে ঐক্যবদ্ধ করতে। সাধারণ মানুষের মনে জাতীয়তাবোধ ও সংহতি চিন্তা না জাগলে জাতীয় আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। বাল গঙ্গাধর তাই শুরু করলেন শিবাজী-উৎসব।

এমন এক উৎসবের মঞ্চে যখন সভাপতির আসনে বসে আছেন

গঙ্গাধর তিলক আর অন্য বক্তারা স্বাধীনতার সম্পর্কে জ্বালাময়ী ভাষণ দিচ্ছেন, সেই সময়ে শ্রোতাদের মধ্য থেকে ধিক্কার দিয়ে উঠল এক যুবক। শুধু বক্তৃতা দিয়ে যারা স্বাধীনতা আনতে চায় তারা ক্লীব। তারা নপুংসক।

সভা শুদ্ধ সবাই তেড়ে গেল যুবককে। কিন্তু তিলক এসে দাঁড়ালেন ছেলেটির পাশে। বললেন, তুমি আমাদের সকলকে নংপুসক বলেছ—মিথ্যা বল নি। দেশে সত্যকার পুরুষ থাকলে র‍্যাণ্ডে বেঁচে থাকতে পারত না।

তিলকের কথায় থমকে গেল যুবক। তার চোখে ভাসল র‍্যাণ্ডের মূর্তি। অত্যাচারী ইংরাজ অফিসার র‍্যাণ্ডে। তার অত্যাচারের সীমা পরিসীমা নেই। নেই কোন নীতি। পুণায় তখন প্লেগ-এর মহামারী চলছে। প্লেগ রুগী অন্বেষণের নাম করে র‍্যাণ্ডে আর তার অনুচরেরা সমগ্র পুণা অঞ্চলে যা চালাচ্ছে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যুবকের চোখ মুখে এক দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ফুটে উঠ্‌ল। যুবক বললে, র‍্যাণ্ডে আর বেশীদিন বাঁচবে না। সে দায় আমি নিলাম।

যুবকের নাম দামোদর হরি চাফেকার। ওরা ব্রাহ্মণ। বাবা সামান্য কীর্ত্তনীয়া। দামোদরেরা তিন ভাই। দামোদর, বালকৃষ্ণ আর বাসুদেব। সকাল সন্ধ্যায় তিন ভাই বাবার সাথে খোল করতাল বাজিয়ে কীর্ত্তন গায়। গোপনে গোপনে গড়ে তোলে বিপ্লবী সমিতি। অস্ত্র শিক্ষা দেয়, সংগ্রহ করে মারাণাস্ত্র। ওরা তিন ভাই তিন স্বভাব-বিপ্লবী। বিপ্লব যেন ওদের রক্তে।

১৮৯৭ সালের ২২শে জুলাই রাতকে বেছে নিল ওরা ওদের কর্ত্তব্য পালনের তিথি হিসাবে। সেদিন থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে মহারাণী ভিক্টোরিয়া গ্রহণ করেছিলেন ইংলণ্ডের শাসনভার। তাই তখন দেশজুড়ে হীরক জয়ন্তী উৎসব চলেছে। র‍্যাণ্ডে বড়ই ব্যস্ত। শহরের সমস্ত খানাপিনায় ছুটোছুটি করছেন তিনি। তিনি

জানেনও না যে তার অলক্ষ্যে তাকে ছায়ায় মত অনুসরণ করছে কয়েক জোড়া চোখ; তার নিয়তি ঘনিয়ে এসেছে।

এখন যেখানে পুণা বিশ্ববিদ্যালয়, তখন সেখানেই ছিল গভর্ণরের বাড়ি। রাত সাড়ে আটটার কাছাকাছি সময়ে দামোদর আর বালকৃষ্ণ, রাণাডে এবং সাঠে নামে দুই সঙ্গীকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন গভর্নরের বাড়ীর কাছে—অন্ধকারে। সঙ্গে দুটো পিস্তল আর দুটো তলোয়ার। কথা আছে, বাসুদেব দূর থেকে র‍্যাণ্ডের গাড়ী চিনে সংকেত জানালে ওরা আক্রমণ করবে।

চারিদিকে চলেছে উৎসবের উল্লাস। বাজির শব্দ আর আলোর ঝলকানি, এর মাঝে চার বিপ্লবী তিল তিল করে সময় পার করছেন শিকারের প্রতীক্ষায়। অবশেষে বারোটার কাছাকাছি সময়ে একদল গাড়ী আসার শব্দ শোনা গেল। তার ভেতর একটা গাড়ীকে র‍্যাণ্ডের গাড়ী বলে চিনতে পারল বালকৃষ্ণ। কিন্তু বাসুদেবের সংকেত? নাই বা এলো সংকেত। বালকৃষ্ণ লাফিয়ে উঠ্‌ল গাড়িতে। কিন্তু গাড়িতে ছিল লেফটানাণ্ট আয়র্স্টে। গুলির ঘায়ে লুটিয়ে পড়লেন। বাজির শব্দে ঢেকে গেল গুলির শব্দ। মিসেস আয়ার্ষ্টের ভয়ার্ত চিৎকারও কেউ শুন্‌ল না। গাড়িটা শুধু একটু দোলা খেয়ে ছুটে চল্‌ল!

বালকৃষ্ণ তখনও জানেন তিনি কার্যসিদ্ধি করেছেন। তিনি উল্লসিত। এমন সময় এলো বাসুদেবের সংকেত। বালকৃষ্ণ বিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

এগিয়ে গেলেন দামোদর। গাড়ির পিছনের কাঁচ ভেঙ্গে একেবারে র‍্যাণ্ডের ঘাড়ের গোড়ায় পিস্তল ধরে করলেন গুলি। তারপর মুহূর্তে সব অস্ত্র এক অকেজো কুঁয়োর মধ্যে ফেলে ওরা সবাই মিলিয়ে গেলেন।

দুই দ্রাবিড় ভাই টাকার লোভে ধরিয়ে দিল দামোদর আর বালকৃষ্ণকে। বাসুদেবের বয়স মাত্র সতেরো। তাই সে তখনও

পুলিশের সন্দেহের বাইরে। কিন্তু দামোদর আর বালকৃষ্ণের ভাই তো বিঘ্ন-হীন সহজ জীবন চায় না। অতএব বিশ্বাসঘাতকের শাস্তির দায় তুলে নিল বাসুদেব।

একদিন রাতে ঐ দুই দ্রাবিড়ভাই যখন তাস খেলছিল তখন বাসুদেব রাণাডের সাথে উপস্থিত হলেন তাদের বাড়ির দরজায়। বললেন, "তাড়াতাড়ি থানায় চলুন। আপনাদের পুরস্কারের সংবাদ এসেছে।"

আনন্দে দু' ভাই দরজা খুলতেই দুজনার চরম পুরস্কার দিয়ে দিল বাসুদেব। যেন তার জীবনের পরম সাধ পূর্ণ হয়েছে—এমন নিশ্চিন্ত ভাবেই ধরা পড়ল পুলিশের কাছে।

এই তিন ভাই এবং রাণাডের ফাঁসীর হুকুম দিয়েছিল ইংরেজ বিচারক। হুকুম শুনে দামোদর বলেছিলেন, "ব্যাস। ফাঁসি! এতেই শেষ? আর শাস্তি নেই?" বালকৃষ্ণ বলেছেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, শুনেছি ফাঁসি হবে।" বাসুদেব হেসে বলেছিলেন, "আমি তো দুটো খুন করেছি। কার জন্য আগে ফাঁসি হবে সেটা বলে দিন হুজুর।" রাণাডে ফাঁসির হুকুম শুনতে শুনতে গল্প করছিলেন বন্ধুদের সাথে।

ফাঁসির সকালে অন্য সেলের আসামী তিলককে প্রণাম করেছিলেন দামোদর। তিলক তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন এক খণ্ড ভগবদ্গীতা। গীতা বুকে চেপে দামোদর ভাইদের দিকে ফিরে বলেছিলেন, "বালকৃষ্ণ! বাসুদেব! তবে আসি!"

ভাইয়েরা বলেছিল, "তুমি যাও। আমরাও আসছি।"

শুনতে শুনতে সেদিনের ঘাতকের চোখে জল এসেছিল কি না, সে কথা ইতিহাস লেখে নি। কিন্তু এই সব তরুণ প্রাণের মাতৃপূজা যে ব্যর্থ হয়নি সে সাক্ষী দিচ্ছে মহাকাল।

হে অমর শহীদেরা আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর!

অনুশীলনী

১। স্বাধীনতার স্বপ্ন গল্পে কাদের অমর শহীদ বলা হয়েছে? তাঁদের গল্প সংক্ষেপে বল। [৩+৭]

২। বাসুদেব ফড়কে সম্বন্ধে যা জান লেখ। তিনি কিভাবে বিপ্লবের আয়োজন করেন? [৫+৫]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৩। "নেতাজীর এই আহ্বানের মধ্যে এক নিগূঢ় সত্য আছে।" এই আহ্বান কি? সত্যটিই বা কি? [২+২]

৪। "ভারতবর্ষে বিশ্বাসঘাতক কম নেই।" এই গল্পে একথা কেন বলা হয়েছে? [৪]

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৫। অর্থ লেখ ও বাক্য রচনা কর :—
নিগূঢ়, সংহতি, জ্বালাময়ী, নপুংসক।

৬। পদ পরিবর্তন কর :—
আলোচনা, পার্বত্য, পুরস্কার, আতঙ্কিত, সহসা।
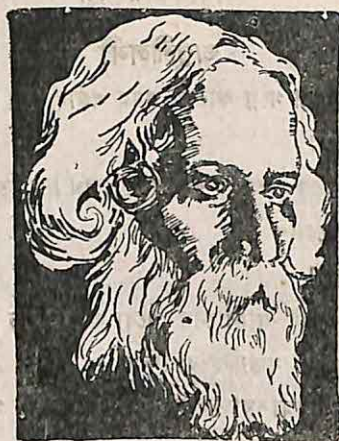
রথের রশি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রথের রশি বা কালের যাত্রা নামক নাটক থেকে সংকলন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে বিংশ শতাব্দীর এক ভাবনাকে নাটকে পরিণত করেছেন।]

মন্ত্রী—(দলপতির প্রতি) এই যে সর্দার! তোমাদের দেখে বড় খুশী হলুম!

দলপতি—মন্ত্রিমশায়, আমরা বাবার রথ চালাতে এসেছি।

মন্ত্রী—চিরদিন তোমরাই তো বাবার রথ চালিয়ে এসেছ, আমরা তো উপলক্ষ মাত্র। সেকি আর জানি নে।

দলপতি—এতদিন আমরা রথের চাকার তলায় পড়েছি,আমাদের দলে দিয়ে রথ চলে গেছে। এবার তো আমাদের বলি বাবা নিল না।

মন্ত্রী—সে তো দেখতে পাচ্ছি। আজ ভোরবেলায় তোমাদের পঞ্চাশজন চাকার সামনে ধুলোয় লুটোপুটি করলে—তবু চাকার মধ্যে একটুও ক্ষুধার লক্ষণ দেখা গেল না, নড়ল না, ক্যাঁ ক্যাঁ করে চীৎকার করে উঠল না—তাদের স্তব্ধতা দেখেই তো ভয়

দলপতি—এবারে রথের তলাটাতে পড়বার জন্য মহাকাল আমাদের ডাক দেন নি—তিনি ডেকেছেন তাঁর রথের রশিটাকে টান দিতে।

পুরোহিত—সত্যি নাকি? কেমন করে জানলে?

দলপতি—কেমন করে জানা যায় সে তো কেউ জানে না। কিন্তু আজ ভোরবেলা থেকেই আমাদের মধ্যে হঠাৎ এই কথা নিয়ে কানাকানি পড়ে গেছে। ছেলেমেয়ে, বুড়ো-জোয়ান সবাই বলছে 'বাবা ডেকেছেন'।

সৈনিক—রক্ত দেবার জন্য।

দলপতি—না, টান দেবার জন্য।

পুরোহিত—দেখো বাবা, ভাল করে ভেবে দেখো, সমস্ত সংসার যারা চালান মহাকালের রথের রশির জিম্বে তাদেরই পরে।

দলপতি—ঠাকুর, সংসার কি তোমরাই চালাও?

পুরোহিত—তা দেখো, কাল খারাপ বটে, তবু হাজার হোক আমরা তো ব্রাহ্মণ বটে।

দলপতি—মন্ত্রিমশায়, সংসার কি তোমরাই চালাও?

মন্ত্রী—সংসার বলতে তো তোমরাই। নিজগুণে চল, আমরা চালাক লোকেরা বলে থাকি আমরাই চালাচ্ছি। তোমাদের বাদ দিলে আমরা ক'জনই বা আছি।

দলপতি—আমাদের বাদ দিলে তোমরা যে ক'জনাই থাকো না, থাকার কী উপায়?

মন্ত্রী—হাঁ, হাঁ, সে তো ঠিক কথা।

দলপতি—আমরাই তো জোগাচ্ছি অন্ন, তাই খেয়ে তোমরা বেঁচে আছো। আমরাই বুনছি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জা রক্ষা।

সৈনিক—সর্বনাশ! এতদিন এরা আমাদেরই কাছে হাত জোড় করে বলে আসছিল, "তোমরাই আমাদের অন্ন-বস্ত্রের মালিক।" আজ এ কী রকমের সব উল্টো বুলি। আর তো সহ্য হয় না।

মন্ত্রী—(সৈনিকের প্রতি) চুপ করো। (দলপতিকে) সর্দার, আমরা তো তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলুম। মহাকালের বাহন তোমরাই, সে কথা আমরা বুঝি নে, আমরা কি এত মূঢ়! তোমাদের কাজটা তোমরা সাধন করে দিয়ে যাও, তারপর আমাদের কাজ করবার অবসর আমরা পাব।

দলপতি—আয়রে ভাই, সবাই মিলে টান দে। মরি আর বাঁচি আজ মহাকালের রথ নড়াবই!

মন্ত্রী—কিন্তু সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চলো। যে রাস্তায় বরাবর রথ চলেছে সেই রাস্তায়। আমাদের ঘাড়ের উপর এসে না পড়ে যেন।

দলপতি—রথের 'পরে রথী আছেন, রাস্তা তিনিই ঠাউরে নেবেন। আমরা তো বাহন। আমরা কী বা বুঝি। আয়রে সবাই। দেখছিস রথের চূড়ায় কেতনটা দুলে উঠছে, স্বয়ং বাবার ইশারা। ভয় নেই, আয় সবাই।

পুরোহিত—ছুঁলে রে ছুঁলে! রশি ছুঁলে! ছি, ছি!

নাগরিকগণ—হায় হায়, কী সর্বনাশ!

পুরোহিত—চোখ বোজ্‌ রে তোরা সব, সবাই চোখ বোজ্‌। মহাকালের মূর্তি দেখলে তোরা ভস্ম হয়ে যাবি।

সৈনিক—ও কী ও! এ কি চাকারই শব্দ নাকি? না আকাশ আর্তনাদ করে উঠল?

পুরোহিত—হতেই পারে না।

নাগরিক—ঐ তো নড়ল যেন।

সৈনিক—ধুলো উড়েছে হে। অন্যায়, ঘোর অন্যায়! রথ চলেছে! পাপ! মহাপাপ!

শূদ্রদল—জয়, জয় মহাকালের জয়।

পুরোহিত—তাই তো একি কাণ্ড হল!

সৈনিক—ঠাকুর হুকুম করো। আমাদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই অপবিত্র রথ চলা বন্ধ করে দিই।

পুরোহিত—হুকুম করতে তো সাহস হয় না। বাবা স্বয়ং যদি ইচ্ছা করে জাত খোয়ান, আমাদের হুকুমে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

সৈনিক—তাহলে ফেলে দিই আমাদের অস্ত্র।

পুরোহিত—আর আমিও ফেলে দিই আমার পুঁথিপত্র।

নাগরিকগণ—আমরা যাই সব নগর ছেড়ে। মন্ত্রীমশায় তুমি কী করবে? কোথায় যাচ্ছ?

মন্ত্রী—আমি যাচ্ছি ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধরতে।

সৈনিক—ওদের সঙ্গে মিলবে?

মন্ত্রী—তা' হলেই বাবা প্রসন্ন হবেন। স্পষ্ট দেখছি ওরা যে আজ তাঁর প্রসাদ পেয়েছে। এ তো স্বপ্ন নয়, মায়া নয়। ওদের থেকে পিছিয়ে পড়ে আজ কেউ মান রক্ষা করতে পারবে না। মান ওদের সঙ্গে থাকে।

সৈনিক—কিন্তু তাই বলে ওদের সঙ্গে সার মিলিয়ে রশি ধরা। ঠেকাবই ওদের। দলবল ডাকতে চললুম। মহাকালের রথের পথ রক্তে কাদা হয়ে যাবে।

পুরোহিত—আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব, মন্ত্রণা দেবার কাজে লাগতে পারব।

মন্ত্রী—ওদের সঙ্গে মিলে রশি ধরো—তা'হলে রক্ষা পাবার পথে রথের বেগটাকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। আর দ্বিধা করবার সময় নেই।

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। 'রথের রশি' নাট্যাংশের কাহিনী নিজের ভাষায় বর্ণনা কর। [১০]

২। 'রথের রশি' নাট্যাংশে মন্ত্রীর উপলব্ধি নিজের কথায় বল। [১০]

৩। এই নাট্যাংশের নাম রথের রশি হ'ল কেন? এখানে রথটি কি? [৬+৪]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৪। রথ থেমে গেছে কেন? [৩]

৬। রথ শূদ্রদের বলি কেন নিল না? [৩]

৬। সৈনিক রথ চলাকে 'পাপ', 'অন্যায়' এসব বলেছে কেন? [৩]

॥ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ॥

আলোচ্য অংশ কাহার রচিত কোন রচনার অংশ। ইহা কে কাহাকে বলেন? তাৎপর্য বর্ণনা কর।

(ক) কেমন করে জানা যায়……বাবা ডেকেছেন।

(খ) কে কাহাকে এই কথা বলেন? বাবার ডাক কি?

(গ) এই ডাক কিভাবে জানা যায়? কানাকানি কেন?

(ঘ) ওদের সঙ্গে মিলে……দ্বিধা করবার সময় নেই।

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৬। শব্দার্থ লেখ :—

মহাকাল, মূঢ়, কেতন, আর্তনাদ, প্রায়শ্চিত্ত, প্রসন্ন।

৭। বাক্য রচনা কর :

লুটোপুটি, কানাকানি, ইশারা, হুড়মুড়।
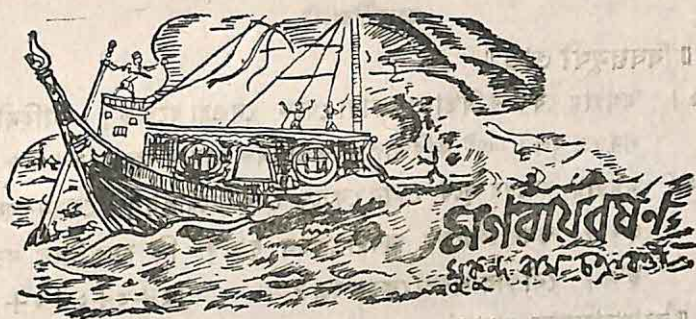
[মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর লেখা চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বিখ্যাত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় কাহিনী ধনপতি সওদাগরের। দেবী চণ্ডীকে অবহেলা করায় ধনপতির নৌকাডুবি হয়। ধনপতি সিংহল রাজের কারাগারে বন্দী থাকেন। তার পুত্র শ্রীমন্ত বের হয় পিতার অন্বেষণে। শ্রীমন্তকে পরীক্ষার জন্য দেবী মায়া বিস্তার করেন। মগরা পৌছাতেই ঝড়-জল শুরু হয়। উদ্ধৃত অংশে তারই বর্ণনা।]

ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে ছুর ছুর॥
নিমেষে জুড়িল মেঘ গগন মণ্ডল।
চারিদিকে বরিষে মুষলধারে জল॥
রবিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার পথ হইল হারা॥
ঘন ঘন বজ্রধ্বনি মেঘের গর্জন।
কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন॥
পরিচ্ছন্ন নহে সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জনক-জননী॥
পূর্বদিকে আইল বন্যা দেখিতে ধবল।
সপ্ততল হয়ে গেল মগরার জল॥
ঝনঝনা পড়ে যেন কামানে কৃপাণ।
ভাঙ্গিয়া নৌকার ঘর করে খান খান॥

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। 'মগরায় বর্ষণ' কবিতাংশ কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে? কাহিনীর পূর্বসূত্র বল। এই কবিতার মূলকথা নিজ ভাষায় বল। [২+৪+৪]

২। মগরায় বর্ষণের পূর্বে কোন কোণে মেঘ জমেছিল? কেমন বর্ষণ হ'ল? তখন লোকের অবস্থা কেমন হ'ল? কি রকমভাবে বন্যা হ'ল? নৌকার অবস্থা কেমন হল? [২+৩+২+২+১]

॥ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ॥

৩। প্রসঙ্গ নির্দেশ করে ব্যাখ্যা কর :—

(ক) 'রবিকর সমান বরিষে জলধারা।'

(খ) পরিচ্ছন্ন নহে সন্ধ্যা দিবস রজনী।

(গ) স্মরয়ে সকল লোক জনক-জননী।

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৪। কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন।'—কেন? এ কথা দ্বারা কবি কি ইঙ্গিত দিয়েছেন? [১+২]

৫। কোন্ দিকে মেঘ আর কোন্ দিকে বাতাস দেখা দিল? বন্যা এলো কোন্ দিক থেকে? [৩]

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৬। নীচের শব্দগুলির অর্থ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর :—

সঘনে-চিকুর, ছুর-ছুর, ঘন-ঘন, ঝন্‌ঝনা।

অভিষেক

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ১৮২৪ সালে যশোর-এর সাগরদাড়ি গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকে ছিল তাঁর কবি হবার সাধ। জীবনকে এ জন্য প্রস্তুত এবং ব্যয় করতে কার্পণ্য করেননি তিনি। অবশেষে মৃত্যুর পূর্বেই তিনি বাঙলার সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকারের সম্মান লাভ করেন। ১৮৭৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।]

উদ্ধৃতাংশ মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'মেঘনাদ বধ' থেকে নেওয়া হয়েছে।

সাজিছে রাবণ রাজা বীরমদে মাতি ;
বাজিছে রণ-বাজনা ; গরজিছে গজ ;
হ্রেষে অশ্ব ; হুঙ্কারিছে পদাতিক রথী ;
উড়িছে কৌশিক-ধ্বজ ; উঠিছে আকাশে
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেন কালে তথা
দ্রুতগতি উতরিল মেঘনাদ রথী।

নাদিলা কর্বুরদল হেরি বীরবরে
মহাগর্বে। নমি পুত্র পিতার চরণে,
করজোড়ে কহিলা, "হে রক্ষ-কুল-পতি
শুনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি !
কিন্তু অনুমতি দেহ ; সমূলে নির্মূল
করিব পামরে আজি ! ঘোর শরানলে

করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে ;
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।”

আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদুস্বরে
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ-লঙ্কাপতি ;—
“রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বৎস ; তুমি
রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি।
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে ?”

উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু ;—
“কী ছার্ সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র ? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘবাহন ; রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে ;
আর এক বার, পিতঃ দেহ আজ্ঞা মোরে ;
দেখিব এবার বীর বাঁচে কী ঔষধে।”

কহিলা রাক্ষসপতি—“কুম্ভকর্ণ বলী
ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে ; হায়, দেহ তার, দেখ, সিন্ধু-তীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে ! তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,—

নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি!
সেনাপতি-পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে;
প্রভাতে যুঝিও বৎস, রাঘবের সাথে।"

এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে।

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। রাবণের রণসজ্জার বর্ণনা দাও। সেই সময় মেঘনাদ এলে সকলে কেমন ভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানাল? [৬+৪]

২। মেঘনাদ কি কি যুক্তি দেখিয়ে সৈনাপত্য দাবী করেন? কি বলে রাবণ তাকে বরণ করলেন? এই কাহিনী থেকে রাবণ ও মেঘনাদের চরিত্র বর্ণনা কর। [৪+২+৪]

॥ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ॥

৩। কে কবে শুনেছে……মরি পুনঃ বাঁচে?

৪। দুইবার আমি……বাঁচে কি ঔষধে।

৫। দেখ, সিন্ধু তীরে……তরু যথা বজ্রাঘাতে।

৬। নীচের শব্দগুলির শব্দার্থ বল :–
বীরমদে, হ্রেষে, হুঙ্কারিছে, কৌশিক-ধ্বজ, কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা, কর্বুরদল, পামর, শরানলে, আলিঙ্গি, কাল-সমরে, বাম মম প্রতি, অম্বুরারি-রিপু, ঘুষিবে, মেঘবাহন, বলী, নিকুম্ভিলা যজ্ঞ, বরিনু, দিননাথ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আধুনিক বাঙলা কবিতার ধারাকে নূতন রীতিতে, নূতন পথে সঞ্চারিত করেছেন।

এই কবিতাটি তাঁর 'কথা' নামক গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।]

নৃপতি বিম্বিসার।
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইল
পাদ-নখ-কণা তাঁর,
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদ কাননে,
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ—
শিল্পশোভার সার।

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি'
রাজবধূ রাজবালা
আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপ-পাদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনক প্রদীপমালা।

অজাতশত্রু রাজা হ'ল যবে,
পিতার আসনে আসি',
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হ'তে
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধ-শাস্ত্ররাশি।

কহিলা ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে,—
"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,—
এই কটি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ হবে।"

সেদিন শারদ দিবা অবসান,—
শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্য-শীতল সলিলে নাহিয়া,
পুষ্প-প্রদীপ থালায় বাহিয়া
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়াল আসি'।

শিহরি' সভয়ে মহিষী কহিলা—
"এ কথা নাহি কি মনে,
অজাতশত্রু করেছে রটনা—
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্বাসন।"

সেথা হ'তে ফিরি' গেল চলি' ধীরে
বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণ-মুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল যে যতনে সিঁদুর
সিঁথির সীমার 'পরে।

শ্রীমতীরে হেরি' বাঁকি গেল রেখা,
কাঁপি গেল তার হাত,—
কহিল,—"অবোধ, কি সাহস-বলে
এনেছিস পূজা, এখনি যা চলে,
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে
বিষম বিপৎপাত।"

অস্ত-রবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি' একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্য-কাহিনী'
চমকি' উঠিল শুনি' কিঙ্কিণী,
চাহিয়া দেখিল দ্বারে।

শ্রীমতীরে হেরি' পুঁথি রাখি' ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে।
কহে সাবধানে তার কানে কানে,—
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমন করে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে?"

দ্বার হ'তে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্য-থালি।
"হে পুরবাসিনী!"—সবে ডাকি কয়,
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময়'—
শুনি' ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি।

দিবসের শেষ আলোক মিলাল'
নগর-সৌধ 'পরে।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হ'য়ে এল ক্ষীণ,
আরতি ঘণ্টা ধ্বনিল প্রাচীন
রাজ-দেবালয়-ঘরে।

শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
অগণ্য তারা জ্বলে।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হ'ল সমাধান"
—দ্বারী ফুকারিয়া বলে।

এমন সময় হেরিলা চমকি'
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার কানন বিজন মাঝারে
স্তূপ-পাদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন, যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মত!

মুক্ত কৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি'
শুধাল',—"কে তুই ওরে দুর্মতি
মরিবার তরে করিস্ আরতি ?"
মধুর কণ্ঠে শুনিল,—"শ্রীমতী,
আমি বুদ্ধের দাসী।"

সেদিন শুভ্র পাষাণ-ফলকে
পড়িল রক্ত-লিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদ-কাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপ-পাদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা!

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

২। পূজারিণী কবিতার কাহিনী বস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [১০]

২। 'পূজারিণী' কবিতায় যে সব চরিত্রের দেখা পাই, শ্রীমতী তাদের চেয়ে বহুগুণে মহৎ।"—একথা সত্য বলে প্রমাণ কর। [১০]

৩। শ্রীমতীর করুণ পরিণতির কারণ কি ? অন্য সকলে শ্রীমতীর সঙ্গে যোগ দিলে কি হ'ত ? শ্রীমতীকে শহীদ বলা যায় কি ? [৫+৩+২]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৪। বিম্বিসারের আমলে কিভাবে স্তূপ নির্মিত হয়েছিল ? তখন স্তূপমূলে কিভাবে সন্ধ্যারতি হ'ত ? [২+২]

৫। অজাতশত্রু রাজা হয়ে কি কি করলেন ? রাজ্যে তাঁর কি আদেশ জারী হ'ল ? [২+২]

৬। রাজাদেশে মহিষী, রাজবধূ এবং রাজকন্যার কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ? [১×৪]

৭। শ্রীমতী কার কাছে কি উপদেশ লাভ করল? [৪]

৮। শ্রীমতী কিভাবে তার শেষ পূজা সমাধান করল? [৪]

॥ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ॥

৯। 'পিতার ধর্ম……বৌদ্ধ শাস্ত্র রাশি।' প্রসঙ্গ বর্ণনা কর। পিতা ও পুত্রের ধর্ম চিন্তায় পার্থক্য কোথায়? পুত্রের মতে ও পথে কোথায় গরমিল? [২+৩+৩)

১০। আঁকিতেছিল সে……সিঁথির সীমার 'পরে।

১১। হে পুরাবাসী……কেহ দেয় তারে গালি।

১২। কে তুই ওরে……করিস আরতি।

১৩। 'সেদিন শুভ্র……শেষ আরতির শিখা।'—প্রসঙ্গ বল। এ ঘটনায় শ্রীমতীর কি পরিচয় ফুটে উঠেছে? 'শেষ আরতির শিখা' বলবার কারণ কি? [৩+২+৩]

ভারতের শিক্ষা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হে ভারত! নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ, শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি মোহমুক্ত চিতে
সর্বফল ব্রহ্মে দিতে উপহার ;
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার ;
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে।
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল
সম্পদের পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল।
শিখায়েছ স্বার্থত্যজি সর্বদুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

অনুশীলনী

১। ভারতবর্ষের শিক্ষাটি কি? এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্য কি?

২। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) শিখায়েছ বীরে……সংহরিতে।

(খ) নির্মল বৈরাগ্য……মঙ্গল।

(গ) শিখায়েছ……সম্মুখে।

৩। গদ্যরূপ বল : ত্যজিতে, অরিরে, সংহরিতে, সম্পদেরে, নৃপতিরে।

নন্দলাল

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

[দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কবি এবং নাট্যকার। তীব্র স্বদেশপ্রেম এবং সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে শাণিত বিদ্রূপ তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। কবিতার ছন্দকেও তিনি গদ্যের ঋজুতা দান করেছিলেন।

এই কবিতাটি তাঁর 'হাসির গান' নামক কাব্য গ্রন্থ থেকে সংকলিত।]

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা করেই হোক্, রাখিবেই সে জীবন।
সকলে বলিল, 'আ-হা- হা কর কি, কর কি নন্দলাল ?'
নন্দ বলিল, 'বসিয়া বসিয়া রহিব কি, চিরকাল ?
আমি না করিলে কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ?'
তখন সকলে বলিল—'বাহবা বাহবা বাহবা বেশ।'
নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা।
সকলে বলিল, 'যাও না নন্দ, কর না ভায়ের সেবা।'
নন্দ বলিল, ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয়-দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক।"
তখন সকলে বলিল—'হাঁ হাঁ হাঁ তা বটে, তা বটে, ঠিক।'
নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির,
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির।
পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন,
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ।

খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল,
তখন সকলে বলিল—'বাহবা বাহবা নন্দলাল।'
নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি ;
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি ;
নন্দ বলিল, "আ-হা-হা ! কর কি, কর কি, ছাড় না ছাই,
কি হবে দেশের, গলা টিপুনিতে আমি যদি মারা যাই ?
বল ক' বিঘৎ নাকে দিব খৎ, যা বল করিব তাহা'
তখন সকলে বলিল—'বাহবা বাহবা বাহবা বাহা।'
নন্দ বাড়ীর হ'তনা বাহির, কোথা কি ঘটে কি জানি ;
চড়িত না গাড়ি, কি জানি কখন উল্টায় গাড়ীখানি,
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ রেলে 'কলিশন' হয়,
হাটিতে সর্প, কুক্কুট আর গাড়ী চাপা-পড়া ভয়,
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল— ভ্যালা রে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। নন্দলাল কবিতায় নন্দলাল যে ভীষণ পণ করে, তা বল, এবং সে পণ কিভাবে সে পূর্ণ করল তা বর্ণনা কর। [২+৮]

২। নন্দলালের স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে বল। [১০]

৩। "নন্দলাল কোন মানুষ নয়—আসলে সে একটা শ্রেণী।"—এমন মন্তব্যের গূঢ় অর্থ বুঝিয়ে বল। [১০]

॥ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ॥

৪। স্বদেশের তরে····· রাখিবেই যে জীবন।

৫। ভায়ের জন্য.. .. দেশের হইবে কি ?

৬। লেখে যত তার···· দশ গুণ।

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৭। নন্দ তার ভাই-এর সেবা করেনি কেন ? [৩]

৮। কাগজ প্রকাশ করে নন্দর শেষ পর্যন্ত কি অবস্থা হয় ? [৩]

৯। নন্দ কি কি কারণে বাড়ির বাইরে যেত না ? [৩]

[সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ছন্দবিশারদ কবি। ২৪ পরগণা জেলার নিমতা গ্রামে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে কবি পরলোক গমন করেন।]

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে।
গিরি মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনু ভরি যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা!

পাষাণের স্নেহধারা! তুষারের বিন্দু!
ডাকে তোরে চিতরোল উতরোল সিন্ধু!
মেঘ হানে জুঁইফুলি বৃষ্টি ও অঙ্গে,
চুমা-চুমকীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে।
ধূলি ভরা দেয় ধরা তোর লাগি ধর্ণা!
ঝর্ণা!

এস তৃষ্ণার দেশে এসে কলহাস্যে
গিরি-দরী বিহারিণী হরিণীর লাস্যে,
ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত
শ্যামলিয়া ও পরশে করগো শ্রীমন্ত,
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা!
ঝর্ণা!

['ঝর্ণা' কবিতাটি মুখস্থ রাখ এবং আবৃত্তি কর।]

অনুশীলনী

১। কবি-চিন্তাকে অনুসরণ করে ঝর্ণার রূপ আঁক।

২। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) পাষাণের······উতরোল সিন্ধু।

(খ) এসো তৃষ্ণার······ভরসায় ভর্ণা।

কুলিমজুর

নজরুল ইসলাম

[বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে সন ১৩০৬ সালে ১১ই জ্যৈষ্ঠ নজরুল ইসলামের জন্ম হয়। নিতান্ত দারিদ্র্য-বশে কবি নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া করতে পারেন নি। তাঁর কবিতার ছন্দ তেজোদীপ্ত, ভাষা ওজস্বিনী ও প্রাণবন্ত। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে বহুবার কারাবরণ করেছেন। কবি বাংলাদেশে অসুস্থ অবস্থায় বেঁচে ছিলেন। সন ১৩৮৩ সাল ১২ই ভাদ্রে বাংলাদেশে তাঁর মৃত্যু হয়।]

দেখিনু সেদিন রেলে
কুলি ব'লে এক বাবুসা'ব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে—
চোখে ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল !
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প শকট চলে,
বাবুসা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে—
বেতন দিয়াছ ?—চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল !
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোড় পেলি বল্ ?

রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলো তো এসব কাহাদের দান ? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা ?—ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জাননাক' কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ রথ ঐ জাহাজ শকট অট্টালিকার মানে !

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ—
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালিয়ে ভাঙিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদেরি গান—
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান !
তুমি শুয়ে রবে তে-তলায় ঘরে, আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে !
সিক্ত যাদের সারা দেহ মন মাটীর মমতা-রসে,
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে।
তারি পদ-রজ অঞ্জলি করি মাথায় লইব তুলি,
সকলের সাথে পথে চলি' যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি !
আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত পীড়িতের মাখি খুন
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ !

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। "কবি 'বাবু' ও কুলি' এই দুই শ্রেণীতে মানুষদের ভাগ করেছেন।" এদের যে দ্বন্দ্বের কথা এই কবিতায় রূপ পেয়েছে তা নিজ ভাষায় বর্ণনা কর। [১০]

২। কবি কাদের দধীচি ব'লেছেন? এই দধীচিদের হাতে কোন অসুরবধ হবে? কিভাবে শুভদিন আসবে? [২+২+৬]

॥ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ॥

৩। বেতন দিয়াছ......কত ক্রোড় পেলি বল?

৪। তুমি জাননাক······অট্টালিকার মানে!

৫। সিক্ত যাদের······তাহাদেরি বশে।

৬। আজ নিখিলের... ..প্রভাতের নবারুণ।

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৭। 'দেখিনু সেদিন রেলে'—কি দেখলেন? কবির মনে কি প্রশ্ন জাগল? [২+২]

৮। 'চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল।' কাদের মিথ্যাবাদী বলা হ'ল? কেন? [২+২]

॥ ব্যাকরণগত প্রশ্ন ॥

৯। অর্থ লেখ :—

দধীচিদের, বাষ্প-শকট, নব-উত্থান, পদরজ, নবারুণ।

১০। গদ্যরূপ জেনে রাখ :—

দেখিনু, চলিছে, শুধিতে, সেবিতে, মাখি, উদিছে।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

[রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালে বাঙলাভাষায় কাব্য লিখে যাঁরা খ্যাত—যতীন্দ্রনাথ তাঁদের অন্যতম। সাধারণ মানুষের প্রতি তীব্র সহানুভূতি আর তারই ফলে ভ্রষ্ট সভ্য-সমাজের প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ কবির কাব্যের প্রধান সুর।

১৮৮৭ সালে বর্ধমান জেলায় কবির জন্ম হয়। তিনি বৃত্তিতে ছিলেন এঞ্জিনিয়ার। ১৯৫৪ সালে তার মৃত্যু হয়।]

(১)

পাচনি লইয়া গোরুর পালের পিছনে যারা
চলেছে দূরের মাঠে,
ছিন্ন বসন, নিবারিতে ঘন শ্রাবণ-ধারা
মাথায় নাহিকো আঁটে ;
গাভীর পুচ্ছ ধরি' যারা তরে বর্ষা-নদী,
জুটে না পারের কড়ি,
হারা-বাছুরের সন্ধানে ফেরে সন্ধ্যাবধি,
কাদায় কাঁটায় পড়ি'
ক্ষুধার অন্ন, পরনের বাস, বাসের গেহ
তাদের যদি না মেলে,
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের কর গো স্নেহ,
তারা মানুষেরই ছেলে।

(৩)

জ্যৈষ্ঠ-তুপুরে গলদ্‌ঘর্ম বলদ লয়ে
চষে যারা রাঙা মাটি,
কত না ঝঞ্ঝা, মুষলের ধারা মাথায় ব'য়ে
ক্ষেত করে পরিপাটী ;
আশা দূরে ভাসে আকাশে আকাশে মেঘের বুকে,
ধরণী-গর্ভে ধন ;
বোকামি পড়ে না শঠতায় ঢাকা যাদের মুখে,
ধূলা কাদা আভরণ ;
অট্টালিকার উপায় থাকিতে নানান-তর,
খড়ো-চালা ঘুচে নাই,
ঘৃণা কি করুণা কোরো না তাদের শ্রদ্ধা কর,
তারা মানুষেরি ভাই।

(৩)

নির্বোধ যারা তুর্বোধ যারা পল্লী-পারে
অশ্লীল যার ভাষা,
আশী শতাব্দী ধরিয়া যাদের দৈন্য বাড়ে,
চির-নাবালক চাষা ;
হলের ফলকে লক্ষ্মা উঠিলে, করিয়া দান
লক্ষ্মীবানের ঘরে,
তুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া, প্রাণ
দেয় যারা নিজ করে ;
বেতসের মত সভ্য শিক্ষা পায়নি যারা
হাওয়ার নেশায় মাতি'
বটের মতো খোলা মাঠ আজো রয়েছে খাড়া,
তারা মানুষেরি জাতি।

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। 'মানুষ' কবিতায় কবি মানুষ বলতে কাদের বোঝাতে চেয়েছেন? শুধু তাদের মানুষ বলবার কারণ কি? [৭+৩]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

২। কবি তাদের ঘৃণা বা করুণা করতে নিষেধ করেছেন কেন? [১+২]

৩। এই কবিতার ভিতর দিয়ে কবির কি মানসিকতা ফুটে উঠেছে? [৩]

॥ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ॥

(ক) আশা দূরে ভাসে আকাশে আকাশে……ধূলা কাদা আভরণ।

(খ) হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে… দেয় যারা নিজ করে।

(গ) বেত্তসের মত সভ্য শিক্ষা……তারা মানুষেরি জাতি।

বাংলার মুখ

জীবনানন্দ দাশ

[রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালে যাঁরা কাব্য রচনা করে বিশিষ্ট সুর ও রীতির সৃষ্টি করতে পেরেছেন, জীবনানন্দ দাশ তেমন একজন কবি। তাঁর লেখা রূপসী বাংলা, ঝরা পালক, বনলতা সেন ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ বিখ্যাত।
কবির জন্ম ১৯০১ এবং মৃত্যু ১৯৫৪ সাল।]

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর : অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে—
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের করে আছে চুপ
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল-বট তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিল ; বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিল হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।

অনুশীলনী

১। কবি কেন আর পৃথিবীর রূপ দেখতে যান নি ?

২। কবি বাংলার রূপকে কেন বেহুলার করুণকাহিনীর সাথে সমান করে তুলেছেন ?

৩। ব্যাখ্যা কর :-

(ক) মধুকর ডিঙা থেকে না জানি······তাহাদের ছায়া দেখেছিল।

(খ) একদিন অমরায় গিয়ে .....মতো তার কেঁদেছিল পায়।

সুদূরের আহ্বান

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম হয় ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে কাশীতে। পৈত্রিক নিবাস ২৪ পরগণার রাজপুর পৌরসভার বৈকুণ্ঠপুরে। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর সাহিত্য চর্চার স্বত্রপাত হয়। তিনি ছোটগল্প, উপন্যাস, চিত্রনাট্য, কাব্য, শিশু-সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন রচনা করেছেন এবং এখনও করছেন।]

অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম,
চেন কি তাদের ভাই?
দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
দুয়েরি বল্গা নাই!

পৃথিবী বিশাল তারা জানিয়াছে, আকাশের সীমা নাই,
ঘরের দেওয়াল তাই ফেটে চৌচির;
প্রভঞ্জনের বিবাগী মনের দোল লেগে নাচে ভাই,
তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির।

বলি তবে ভাই, শোনো তবে আজ বলি,
অন্তরে আমি তাহাদেরই দলের দলী;
রক্তে আমার অমনি গতির নেশা;
নাসায় অগ্নি স্ফুরিছে যাহার, বিজলী ঠিকরে খুরে
আমি শুনিয়াছি সেই হয়রাজের হ্রেষা।

যে-শোণিতধারা ঘুমায়ে কাটালো পুরুষ চতুর্দশ,
দেখি আজো ভাই লাল তার রঙ, তাজা তার জৌলস!

আজো তার মাঝে শুনি সে প্রথম সাগরের আহ্বান ;
করি অনুভব কল্পনাতীত সৃষ্টির উষা হতে
তার জয় অভিযান ।

তপতী কুমারী মরু আজ চাহে প্রথম পায়ের ধূলি ;
অজানা নদীর উৎস ডাকিছে ঘোমটা আধেক খুলি ।
নিঃসঙ্গ গিরিচূড়া
তুহিন তুষার-শয়নে আমারে স্মরিছে বিরহাতুরা ।
অগ্নি আখরে আকাশে যাহারা লিখেছে আপন নাম,
আমি যে তাদের চিনি ।
দুই তুরঙ্গ তাহাদের রথে, উদ্ধত উদ্দাম,
—শোনো তার শিঞ্জিনী ।
মোদের লগ্ন সপ্তমে ভাই রবির অট্টহাসি,
জন্ম তারকা হয়ে গেছে ধূমকেতু
নৌকা মোদের নোঙর জানে না,
শুধু চলে স্রোতে ভাসি—
কেন যে বুঝি না, বুঝিতে চাহিনা হেতু!

অনুশীলনী

১। 'সুদূরের আহ্বান' কবিতাটির বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লেখ।
২। কবি কোন্ সুদূরের আহ্বান শুনতে পেয়েছেন ?
৩। 'সুদূরের আহ্বান' কবিতাটির প্রথম ও শেষ স্তবক মুখস্থ লেখ।
৪। ব্যাখ্যা লিখ :—
(ক) পৃথিবীর বিশাল তারা জানিয়াছে…তাদের হৃদয়-সমুদ্র অস্থির।
(খ) রক্তে আমার…… শুনিয়াছি সেই হয়রাজের হ্রেষা।
(গ) তপতী কুমারী মরু আজ……আমারে স্মরিছে বিরহাতুরা।

আকবর

হুমায়ুন কবীর

[হুমায়ুন কবীর আধুনিক কালের বাঙলা সাহিত্যের একজন শক্তিমান মুসলমান কবি। তিনি এক সময়ে ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। তাঁর জন্ম ১৯০৪ সালে। কবি ১৯৬৭ সালে মারা যান।

এই কবিতায় কবি আকবরের সমাধির পাশে বসে, আকবরের মহামিলন মন্ত্রের কথা চিন্তা করেছেন। বর্তমান হিংসা-বিক্ষুব্ধ পরিবেশের প্রেক্ষাপটে আকবরের আদর্শ আরও মহৎ হয়ে উঠেছে।]

হে সম্রাট্, ব'সে আছি আজি তব সমাধির পাশে,
একান্ত বিজন!
দূর হ'তে অরণ্যের অন্ধকার ভেদি' ভেসে আসে
বিহগ-কূজন।
নীরব মধ্যাহ্ন বেলা শব্দহীন, নিঃসাড় ভুবন
কেহ কোথা নাই,
অকস্মাৎ মর্মরিলে তরুশাখে মন্থর পবন
চমকিয়া চাই!

তোমার হৃদয় ভরি' জেগেছিল কি মহা স্বপন!—
এ ভারত-ভূমি,
এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, একনিষ্ঠ মন,—
বেঁধে দিবে তুমি!

সমাজ-আচার-ভেদ, ধর্মভেদ ভুলে যাবে সবে ;
রহিবে স্মরণ—
এক মহাদেশে বাস, চিরদিন একসাথে হবে
জীবন-মরণ !

হায় ! স্বপ্ন টুটে যায় কঠিন ধরার ধূলা লাগি',
দেখি আঁখি মেলি'—
ক্রুর সর্পসম হিংসা হিয়া-তলে রহিয়াছে জাগি',
উঠিছে উদ্বেলি'।
তোমার সমাধি-পাশে বসি' আজি পড়ে মোর মনে
তোমার কীরিতি ;
নিখিল ভারত ভরি' উঠেছিল ধ্বনিয়া গগনে
মিলনের গীতি।

তোমার মহৎ হিয়া পুনর্বার আসুক ফিরিয়া
আমাদের মাঝে ;
আত্মদ্বন্দ্ব-সর্বনাশ আমাদের রেখেছে ঘিরিয়া
অপমানে লাজে।
হে মহৎ, তব বাণী নিখিল ভারত ভরি' আজি
জাগুক আবার ;
উঠুক মিলন-মন্ত্র সাম্যবাদ কম্বুকণ্ঠে বাজি'
টুটিয়া আঁধার !
হিংসা-দ্বেষ—মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো—শঙ্কাভরে !
হোক শান্ত হোক্
আঁধারের প্রাণী যত ফিরে যাক্ আঁধার বিবরে,
নামুক আলোক।

অনুশীলনী

১। আকবরের সমাধির পাশে বসে কবির মনে কি কি 'চিন্তার উদয় হয়েছে।

২। কবি কেন প্রার্থনা করেছেন "তব বাণী নিখিল ভারত ভরি, আজি জাগুক আবার।"

৩। আধুনিক ভারতে কবি আকবরের মহৎ চিন্তার পুনঃ প্রতিফলন চাইছেন কেন?

৪। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) এক ধর্ম এক রাজ্য এক জাতি……বেঁধে দেবে তুমি।

(খ) হায়! স্বপ্ন টুটে যায় কঠিন ধরার ধূলি লাগি……উঠেছে উদ্বেলি'।

(গ) হে মহৎ 'তব বাণী…… ভারত ভরি' আজি জাগুক আবার।

(ঘ) হিংসাদ্বেষ মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মত……নামুক আলোক।

ইলিশ

বুদ্ধদেব বসু

[১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে বুদ্ধদেব বসু জন্মগ্রহণ করেন কুমিল্লায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম.এ.পাশ করে কলকাতায় অধ্যাপনা শুরু করেন। সাহিত্য রচনার শুরু বাল্যকাল থেকে। কবিতা প্রবন্ধ-উপন্যাস-ছোটগল্প-কাব্যনাট্য ইত্যাদি সাহিত্যের প্রায় সব ঘরে বুদ্ধদেবের মত স্বচ্ছন্দ পদার্পণ খুব কম লেখকই করেছেন। এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুজ। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই মার্চ তিনি পরলোক গমন করেন।]

আকাশে আষাঢ় এল ; বাংলাদেশ বর্ষায় বিহ্বল।
মেঘবর্ণ মেঘনার তীরে-তীরে নারিকেলসারি
বৃষ্টিতে ধূমল ; পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর রাজবাড়ী
বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপট-সম অচঞ্চল।
মধ্যরাত্রি ; মেঘ-ঘন অন্ধকার ; দুরন্ত উচ্ছল
আবর্তে কুটিল নদী-তীর—তীব্র বেগে দেয় পাড়ি
ছোটো নৌকাগুলি ; প্রাণপণে ফেলে জাল, টানে দড়ি
অর্ধ-নগ্ন যারা, তারা খাদ্যহীন—খাদ্যের সম্বল।
রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধ কালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি-রাশি ইলিশের শব,
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস সর্ষের ঝাঁঝে। এল বর্ষা, ইলিশ-উৎসব।

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। বর্ষার বর্ণনা করতে বসে কবি কিভাবে ইলিশের বেদনায় বিবশ হয়েছেন। কবির ভাবগুলি অনুক্রমে বর্ণনা কর। [১০]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

২। মেঘনাকে মেঘবর্ণ বলা হয়েছে কেন? [৩]

৩। "শতাব্দীর রাজবাড়ি? বলতে কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন? [৩]

৪। "টানে দড়ি অর্দ্ধ নগ্ন যারা"—কবি এখানে কাদের কথা বলছেন? এদের সম্পর্কে কবির মনোভাব কি? [৩]

৫। বর্ষাকে 'ইলিশ উৎসব' বলার সার্থকতা কি? [৩]

॥ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ॥

৬। পদ্মাপ্রান্তে শতাব্দীর......বিলুপ্তির প্রত্যাশায় দৃশ্যপটসম অচঞ্চল।

৭। মধ্যরাত্রি, মেঘ ঘন······তারা খাদ্যহীন খাদ্যের সম্বল।

৮। রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে······মৃত্যুর পাহাড়।

৯। তারপর কলকাতার......নিবিড়তম উল্লাসের ইলিশ উৎসব।

চাঁদ-দীঘি

মোঃ কাদের নওয়াজ

[ইনি বাঙলার মুসলমান কবিদের অন্যতম।

জন্ম ১৯০৯ সাল। কবি বর্দ্ধমানের মঙ্গলকোটের বিখ্যাত কাজী পরিবারের সন্তান। দিনাজপুর স্কুলের প্রধানশিক্ষক ছিলেন। বর্তমানে 'বাংলাদেশে' বাস করছেন।]

আমাদের গাঁয়ে আছে এক দীঘি, চাঁদ-দীঘি, তার নাম ;
স্বচ্ছ সলিল—গাগরী-ভরণে ঢেউ খেলে অবিরাম।
মাছরাঙ্গা আর জলপিপি আসি' বিচরে দীঘির বুকে,
চৌদিকে তার গাংচিল উড়ি' শিকার ধরিছে সুখে।
চিংড়ি পাইয়া 'বেনে-বুড়ি' কভু উড়িয়া বসিছে গাছে,
গোটা গোটা মাছ গিলিতে ছুটিছে জলের পোকার পাছে।
বালিহাঁস শুধু ঝগড়াই করে জল-পায়রার সনে,
ঘুরেঘুরে আর বেঙাচি কেবল সেই খাবে নিরজনে ;
কিল্‌বিল করি' কর্দম কীট যেমন নড়িয়া উঠে,
কাদাখোঁচা তারে আছাড়িয়া মারে ধরিয়া দীঘল ঠোঁটে।
সারাদিনকার শ্রান্তি জুড়ানো এই দীঘিটির ঘাটে
হাসি-কলতানে গ্রামবধূদের বিকালবেলাটি কাটে।
সকলেই জানে—এই দীঘিটিরে চাঁদ চৌধুরী মিয়া
খুঁড়িয়াছিলেন মন্বন্তরে বেদনার স্মৃতি নিয়া।
চাঁদ' গিয়াছেন চাঁদের আড়ালে, চাঁদ-দীঘি আজো আছে,
ঢল ঢল জল, 'কাঁসাতলি' ভাসে, কলমী-রাণীর নাচে ;
আজিও প্রভাতে কুবলয় কত ফুটে থাকে দীঘি-নীরে,
অচেনা পথিক পথে যেতে শুধু চেয়ে দেখে ফিরে ফিরে।
পূর্ণিমা-রাতে আকাশের চাঁদ শত চাঁদ হয়ে ভাসে,
চাঁদ-দীঘি নাম সার্থক করে চাঁদ মিয়া যেন হাসে।

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। কবিতাটির সারবস্তু সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [১০]

২। চাঁদ-দীঘির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দাও। [১০]

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৩। কবিতাটিতে কি কি পাখীর নাম পাও?

৪। চাঁদ দীঘি কে খুঁড়েছিলেন? কেন?

৫। এখানে কি কি জলজ-উদ্ভিদের নাম পাও?

॥ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ॥

৬। সারাদিনকার শ্রান্তি…হাসি কলতানে গ্রামের বধূদের বিকালবেলাটি কাটে।

৭। সকলেই জানে… …খুঁড়িয়াছিলেন মন্বন্তরে বেদনার স্মৃতি নিয়া।

৮। অচেনা পথিক… …পথে যেতে শুধু দেখে ফিরে ফিরে।

৯। পূর্ণিমা-রাতে…সার্থক করে চাঁদ মিয়া যেন হাসে।

একটি মোরগের কাহিনী

সুকান্ত ভট্টাচার্য

[সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯২৬ সালে। মৃত্যু ১৯৪৭ সালে। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। এই কবির মধ্যে যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তা অঙ্কুরেই শেষ হয়ে যায়। এজন্য অনেকে সুকান্তকে ইংলণ্ডের বালক-কবি চ্যাটার্টনের সাথে তুলনা করেন।]

একটি মোরগ হঠাৎ আশ্রয় পেয়ে গেল
বিরাট প্রাসাদের ছোট্ট এক কোণে
ভাঙা প্যাকিং বাক্সের গাদায়—
আরো দু তিনটি মুরগীর সঙ্গে।
আশ্রয় যদিও মিলল,
উপযুক্ত আহার মিলল না।
সুতীক্ষ্ণ চীৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে
গলা ফাটালো সেই মোরগ,
তবু সহানুভূতি জানাল না সেই শক্ত বিরাট ইমারত।
তারপর শুরু হল তার আস্তাকুঁড়ে আনাগোনা :
আশ্চর্য! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগল
ফেলে দেওয়া ভাত-রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার।
তারপর আস্তাকুঁড়েও এল অংশীদার
ময়লা ছেড়া ন্যাকড়া পরা দু-তিনটে মানুষ,
কাজেই দুর্বলতর মোরগের খাবার গেল বন্ধ হয়ে।

খাবার ! খাবার ! খানিকটা খাবার !
অসহায় মোরগ খাবারের সন্ধানে
বারবার চেষ্টা করল প্রাসাদে ঢুকতে
প্রত্যেকবারই তাড়া খেল প্রচণ্ড।
ছোট্ট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে—
প্রাসাদের ভিতর রাশি রাশি খাবারের।
তারপর সত্যিই সে প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে ;
অবশ্য খাবার খেতে নয়
খাবার হিসাবে॥

অনুশীলনী

॥ বিষয়মুখী প্রশ্ন ॥

১। মোরগের কাহিনীটি নিজের ভাষায় বল। [১০]

২। মোরগকে কোন কোন স্তরে কি কি শত্রুর সাথে লড়াই করতে হয় ? [১০]

৩। "সামান্য একটি মোরগের কাহিনীর ভিতর দিয়ে কবি শোষিত মানুষের এক করুণ চিত্র এঁকেছেন।"—একথা বলা ঠিক কি ? কেন ? [২+৮]

॥ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন ॥

৪। সুতীব্র চিৎকারে প্রতিবাদ জানিয়ে……সেই শক্ত বিরাট ইমারত।

৫। আশ্চর্য, সেখানে প্রতিদিন……ভাত রুটির চমৎকার প্রচুর খাবার।

৬। কাজেই দুর্বলতর মোরগের……খাবার গেল বন্ধ হয়ে।

৭। অবশ্য খাবার খেতে নয়, খাবার হিসেবে।

॥ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ॥

৮। মোরগটির স্বভাবে কি কি বৈশিষ্ট্য দেখলে ? [৩]

৯। মুরগী কোথায় থাকত ? কেন সে চিৎকার করত ? [১+২]

১০। 'আশ্চর্য ! সেখানে প্রতিদিন মিলতে লাগল…'
কি মিলতে লাগল ? এতে আশ্চর্যের কি ছিল ? [১+২]